রাসলীলার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on *Bhagabat Puran* before the students of Indian Spiritual Heritage Diploma Course at Ramakrishna Vivekananda University, Belur Math in the year 2011
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

রাসলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে আমাদের ভাগবত সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জিনিষ জেনে নেওয়া দরকার। ভাগবতের দশম স্কন্দের পুরোটাই হল শ্রীকৃষ্ণলীলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে কংসের কারাগারে জন্ম নেওয়া থেকে তাঁর পার্থিব লীলার শেষ দিন পর্যন্ত যা কিছু লীলাকথা সবই এই দশম স্কন্দে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবত যখন খুব সংক্ষেপে পাঠ করা হয় তখন এই দশম স্কন্দকেই পাঠ করা হয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ভাগবতের দশম স্কন্দ খুবই উচ্চমানের। প্রথম কথা ভাগবতের ভাষা অত্যন্ত কঠিন, বলাই হয় যে ভাগবতে পণ্ডিতদের পরীক্ষা হয়ে যায়। দ্বিতীয় কথা হল ভাগবতের প্রত্যেকটি শ্লোককে এবং শ্লোকের কিছু কিছু শব্দকে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তৃতীয় কথা হল ভাগবতের এই দশম স্কন্দে ভাবের যে বর্ণনা আমরা পাই, আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ভাবগুলিকে ধারণা করা দূরে থাক বুঝতেই পারাটাই খুব কঠিন হয়ে যায়। প্রচুর জপ-ধ্যন ও তপস্যা করে করে একটা বিশেষ স্তরে না পৌঁছান পর্যন্ত এই ভাবগুলোকে বোঝা প্রায় একেবারেই অসম্ভব। খুব উচ্চ ভাবরাজ্যের সাধক না হলে এই ভাবগুলিকে গ্রহণ করতে পারা যাবে না। সেইজন্য প্রথম থেকেই বলা হয়ে আসছে ভাগবতের এই দশম স্কন্দ বিশেষ করে চীরহরণ আর রাসলীলা সাধারণ মানুষের সামনে আলোচনা করতে নেই। সাধারণ মানুষের সামনে চীরহরণ আর রাসলীলা আলোচনা করলে এর আধ্যাত্মিক উচ্চ ভাবগুলি জাগতিক ভাব রসে বিকৃত হয়ে যাওয়াটা কোন অস্বাভাবিক নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ পণ্ডিতরা ভাগবতের এই চীরহরণ আর রাসলীলাটাই সবার সামনে বেশী করে পাঠ করেন।

জালালউদ্দিন, রুমি প্রভৃতি সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় আটশ কি তারও বেশী বছর ধরে যে ভাবে ঈশ্বরের সাধনার প্রথা আজ পর্যন্ত চলে আসছে, যদিও পাকিস্থান প্রভৃতি মুসলিম দেশে সুফিদেরকে সহ্য করা হয় না কিন্তু দিল্লীতে এখনও অনেক সুফি সাধকরা যে ভাবে সাধনা করে চলেছেন, তাদের সাথে আলাপ না করলে বোঝা যায় না ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। অত দূর না গিয়েও যদি স্বামী সারদানন্দ রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের মধুর ভাবে সাধনার অংশটুকুও যদি কেউ অধ্যয়ণ করেন সেখানেও ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কি রকম গভীর থেকে গভীরতর হতে পারে তার কিছু ধারণা করতে পারবেন। সেখানে ঠাকুরও বারবার বলছেন ঈশ্বরের প্রতি গোপীদের ভাব বোঝা খুব কঠিন। তিব্বতে এর আগে অনেক দালাই লামা হয়েছিলেন। অনেক আগের এক দালাই লামার বিবরণে যা বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে বলা হচ্ছে যে তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাপারে একটুও নাকি মন ছিল না। তিনি শুধু প্রেমের কবিতাই লিখতেন। বর্ণনাতে যেটুকু জানা গেছে তাতে দেখা যায় সেই সময় ধর্মের ব্যাপারে তীব্বতে কারুরই কোন আগ্রহ ছিল না। ধর্মের ব্যাপারে যত না আগ্রহ তার থেকে বেশী আগ্রহ ছিল দালাই লামার প্রেমের কবিতা মুখস্ত করা। সবারই মুখে মুখে তখন দালাই লামার প্রেমের কবিতার গান। কিন্তু কপাল এমনই যে সেই দালাই লামা অল্প বয়সেই মারা যান। বৌদ্ধধর্ম যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তারপরেই সেই প্রেমের কবিতাগুলোকে তাঁরা ভগবান বুদ্ধের প্রতি ভালোবাসার কবিতা বলে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায় কবিতাগুলো কোন নারীকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আর একজন নারীর প্রতি ভালোবাসা এই দুটো এমন সমান্তরাল ভাবে চলে যে, খুব সহজে একটু এদিক ওদিক করে যে কোন দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। নারীর প্রতি যে ভালোবাসার বর্ণনা করা হয়, সেই ভালোবাসাকে কোন বৌদ্ধিক ভক্ত খুব সহজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে এই ভালোবাসাকে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিক এই একই সমস্যা হয় যাদের কলুষিত মন তারা খুব সহজে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাকে জাগতিক দৈহিক সম্পর্কে পর্যবসিত করে দিতে পারে।

কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ খুব বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। ভাগবতে রাসলীলাকে যে অবস্থায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রগাঢ় ভক্তি ভাবকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, গীতগোবিন্দে কবি জয়দেব ভক্তিকে সেখান থেকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মহাপণ্ডিত নিরোদ চৌধুরী তাঁর একটি প্রবন্ধমূলক বইতে বর্ণনা করছেন কিভাবে হিন্দু শাস্ত্র এই কাম জিনিষটাকে খুব কৌশল করে ধর্মের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেদের কামভাবকে ধর্মের নাম চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছে। এই ধরণের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক উচ্চ ভাব, ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা কোন পর্যায়ে যেতে পারে বিশেষ করে মধুর ভাব যদি এই ধরণের বৌদ্ধিক লোকেদের হাতে পড়ে যায় তখন তারা ব্যাখ্যা করে এত নোংরা পর্যায়ে নামিয়ে দেন যে কল্পনা করা যায় না। আর যারা অতি সাধারণ লোক, যারা একেবারেই আধ্যাত্মিক ভাবশূন্য এই ভাবগুলি তাদের স্বাভাবিক

চিন্তাধারাকে কলুষিত করে দেবে। সেইজন্য প্রথম থেকেই নিষেধ করা আছে এই জিনিষগুলিকে সবার সামনে বলতে নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন পুরানই অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, পুরান কখনই কাব্যগ্রন্থ নয়। অথচ বুদ্ধিজীবিরা পুরানকে কাব্যগ্রন্থ রূপেই দেখেন। যে কোন ধর্মগ্রন্থকে সাহিত্য বা কাব্যগ্রন্থ রূপে দেখা হয় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। একটা গ্রন্থকে যে বিচার করছে, বিচার করার সময় সেই বইয়ের প্রেক্ষাপট অনুসারেই তার প্রশিক্ষণ হওয়া উচিৎ।

প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। রাম জন্মভূমি নিয়ে হাইকোর্টে একটা মামলা হওয়ার পর হাইকোর্ট একটা রায় দিয়েছিল। সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে যখন আপীল করা হল তখন সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরা বলছেন হাইকোর্টের বিচারকরা কি করে এই রায় দিলেন সত্যিই অকল্পনীয়। সুপ্রীম কোর্ট এই ব্যাপারে কি রায় দেবে সেটা তাদের ব্যাপার। রামজন্মভূমির মূল ইস্যু ছিল এইখানে আগে মন্দির ছিল কি ছিল না। এই ব্যাপারটা নির্ধারণের জন্য তিন জন ইতিহাসবিদের মত নেওয়া হয়েছিল। তিনজন ইতিহাসবিদই মত দিলেন এটা কখনই রামজন্মভূমি হতে পারেনা। এরপর সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরা যখন এই তিনজনকে জেরা করতে শুরু করেছেন তখন দেখা গেল এরা কেউই এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নয়। মজার ব্যাপার হল এক নম্বর ইতিহাসবিদ দুই নম্বরকে কোট করছে, দুই নম্বর তিন নম্বরকে আর তিন নম্বর এক নম্বরকে কোট করছে। তিনজন বিচারকই অবাক হয়ে এই তিন ইতিহাসবিদকে বলছেন আপনারা আদৌ কেউই পুরাতত্ত্ববিদ নন, মানে সেই সময়কার ঐতিহাসিক নন। আপনার কি করে এই ধরণের প্রবন্ধ লিখছেন, বই লিখছেন, মতামত দিচ্ছেন, আপনাদের মতামত নিয়ে পুরো দেশের মানুষ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। আর এখানে আপনারা এর ওর, সে তার মতামত নিয়ে এত বড় একটা ইস্যুতে মতামত দিয়ে দিচ্ছেন! এইভাবে তো হয় না। এই ইতিহাসবিদরা যে জিনিষটা উল্লেখ করেননি তা হল আর্কোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার একটা গোপন নোট। পরে যখন গোপন নোটটা বার করা হল তখন সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলছেন, অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে মন্দির ছিল কি ছিল না আমরা বলতে পারব না। কিন্তু এই জায়গাতে একটা কাঠামো পাওয়া গেছে যেটা মন্দিরের মত। এরপর থেকে রামজন্মভূমি নিয়ে বুদ্ধিজীবিদের গলাবাজী বন্ধ হয়ে গেছে। বুদ্ধিজীবিরা কি করতে পারে আর কি করতে পারেনা চিন্তাই করা যায় না, পুরো দেশের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এরা সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু ভাগবতাদির মত উচ্চ ধরণের গ্রন্থ যেখানে অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবকে সামনে নিয়ে আসছে, যে ভাবকে বুদ্ধিজীবিরা বিকৃত করে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপিত করে তাদের মনকে খুব সহজে নিজের দেহের সঙ্গে যোগ করে দিয়ে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ঠাকুর যখন ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উচ্চ ভাবে নৃত্য করছেন তখন তার পরনের কাপড় খুলে যাচ্ছে কিন্তু কোন হুঁশ নেই। সমাধি অবস্থায় তাঁর ধুতি বগলে চলে আসছে। কখন ধুতি খুলে খালি গায়ে খেতে বসেছেন। এগুলোকে নিয়ে কিছু লেখক নোংরা নোংরা অর্থ করে ব্যাখ্যা করছে। ঈশ্বরীয় ভাবের অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশকে নিয়ে এই ভাবে নোংরা নোংরা মন্তব্য করা বা লেখা খুবই বিপজ্জনক। যাঁরাই নিজেদের ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অংশীদার মনে করতে চাইছেন তাঁদের জেনে রাখা উচিৎ ভাগবতাদির মত গ্রন্থ যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা কেউই কবি নন, এনারা সবাই ঋষি, শুধু ঋষিই নন, অত্যন্ত উচ্চমানের ঋষি। জাগতিক বা দৈহিক সম্পর্কজনিত কোন কিছুই এনারা লিখবেন না, এঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য শুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবের অনুভূতি লাভ, আধ্যাত্মিকতার বাইরে এনারা কিছুই রচনা করতে যাবেন না।

মধুর ভাব হল আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম ভাব। একমাত্র গোপীদেরই ঠিক ঠিক এই মধুর ভাব ছিল, যেখানে নিজের ইষ্টকে নিজের স্বামী, প্রিয়তম, প্রেমিক ভাবে সাধনা করা হচ্ছে। মধুর ভাবের শেষ কথা গোপীরা। নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছে সা তু পরমাপ্রেমস্বরূপা। ভক্তির শেষ কথা প্রেমে। এই সূত্রকে যখন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তখন বলছেন যথা ব্রজগোপীকানাম্, ব্রজের গোপীদের দেখলে এই প্রেমকে জানা যায়। যদি না দেখা হয় তখন এটাই হয়ে যায় জারানামিব, এই প্রেম তখন দৈহিক সম্বন্ধের হয়ে যাবে। গোপীদের ভালোবাসা উচ্চতম ভক্তি, যে পরমপ্রেম তার স্বরূপ।

আমরা যদি মেনে নিই মহাভারত আর পুরান ব্যাসদেবরই রচনা তাহলে মহাভারতে একটি শ্লোকও পাওয়া যাবে না যেখান শৃঙ্গার রসের কথা বলা হয়েছে। ভাগবতে চীরহরণ, রাসলীলাতে কোথাও গোপীদের সৌন্দর্যের বর্ণনা নেই কিন্তু ভাবের বর্ণনা আছে। ভাবের বর্ণনা করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী কোথাও এতটুকু অন্য কিছু কোন ধরণের বর্ণনা করা হচ্ছে না। একেই ব্যাসদেব রচনা করেছেন, আর সেই রচনা পরীক্ষিৎকে শোনাচ্ছেন শুকদেব। শুকদেবকে বলা হয় আদর্শ সন্ন্যাসী। শুকদেবকে কারুর সাথে তুলনা করা যায় না, যদি তুলনা করতে হয় তাহলে শুকদেবকে সাক্ষাৎ শিবের সঙ্গেই তুলনা করতে হবে। সেই শুকদেব জনসমক্ষে রাজা পরীক্ষিৎকে চীরহরণের মত ভগবানের লীলাকথা বর্ণনা করছেন। এখানেই বোঝা যায় এগুলো কত উচ্চতম ভাব।

চীরহরণ লীলা কাহিনীতে দুটো দিক আছে। ভাগবতের মতে চীরহরণের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স সাত কি আট। চীরহরণকে যদি লৌকিক দৃষ্টিতেও দেখা হয় তাহলে এই আট বছরের বাচ্চার নারীদেহ সম্বন্ধে কি কৌতুহল থাকবে! আর যদি দিব্য দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন সেখানে আবার কোন বিষয় পাওয়া যায় না। কার্তিক স্নান মেয়েদের খুব পুরনো ব্রত। এই এক মাস মেয়েরা সূর্যোদয়ের আগে ভোরবেলা নদীতে স্নান করতে যেত। বৃন্দাবনে গোপীরাও যমুনায় কার্তিক স্নান করত। বস্ত্রহীন হয়ে নদী বা জলাশয়ে স্নান করাটা ভারতের খুব পুরনো প্রথা। মহাভারতে এই প্রথার নিন্দা করা হয়েছে আর মনুস্মৃতিতে খুব কড়া ভাবে নিষেধ করে বলা হয়েছে, নদীতে যখন স্নান করবে তখন বস্ত্র পরিধান করেই স্নান করতে হবে। বৃন্দাবনে তখনও ঐ প্রচলনটা ছিল, গোপ কুমারি বালিকারা বস্ত্রহীন হয়েই স্নান করতে যেত। শ্রীকৃষ্ণের নজরে এই ব্যাপারটা এসেছে। তিনি গোপীদের ধরে বললেন 'তোমরা যে এইভাবে কাপড় ছেড়ে নদীতে স্নান করতে যাচ্ছ এটা কিন্তু বরুণ দেবতার প্রতি অপরাধ করা হচ্ছে। বরুণ দেবতাদের কাছে তোমাদের ক্ষমা চাইতে হবে'। বস্ত্রগুলো গাছে ঝুলিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন। কার্তিক স্নান সূর্যোদয়ের অনেক আগে অন্ধকার থাকতেই করতে হত। এখনও অন্ধকার, কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে রোদ উঠে যাবে, তখন আরও কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। এরা এখন কি করবে! তৃতীয় কথা হল, কার্তিক স্নান পুরো এক মাস ধরে সূর্যোদয়ের আগে করতে হয়। কুমারীরাই এই ব্রত বেশী পালন করত যাতে মনের মত স্বামী পায়। এখানে যত গোপীরা ছিল তাদের মনের মত স্বামী হলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সাক্ষাৎ ভগবান। সেইজন্য এই কাহিনীগুলোকে যখনই জাগতিক বা লৌকিক দৃষ্টিতে দেখা হবে তখনই বিপর্যয় হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী। ঠিক আছে তোমরা আমার মতই বর চাইছ কিন্তু তোমাদের মধ্যে এখনও অনেক অষ্কট-বষ্কট আছে। আমি এই গোলমালগুলো দূর করে দিচ্ছি। তাই প্রথমে তোমার ইষ্টের প্রতি যে লজ্জা সঙ্কোচের ভাব সেটাকে সরিয়ে দিলাম। শ্রীশ্রীমা খুব সুন্দর বলছেন 'সন্তান যতই ময়লা মেখে আসুক এটা মায়ের কাজ সন্তানের ময়লা পরিষ্কার করে তাকে কোলে তুলে নেবে'। মা আর শিশুর যা সম্পর্ক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ইষ্ট আর ভক্তের একই সম্পর্ক। ভক্তের মধ্যে যদি কোন গোলমাল থেকে থাকে তাহলে ভক্তের সাথে ইষ্টের কোন দিন মিলন হবে না। ঠাকুর উপমা দিয়ে বলছেন – ছুঁচে মাটি লেগে থাকলে চুম্বক ছুঁচকে টানতে পারে না। তার আগে ছুঁচের কাদামাটি ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ভক্তের হৃদয়ের নোংরা কিভাবে পরিষ্কার করবে? চোখের জল দিয়ে। ঈশ্বরের জন্য চোখের জল ফেলে কাদামাটি ধুয়ে ফেলতে হবে। এরপর চুম্বক তাকে টেনে নেবে। অন্য পথ হল জলে তাকে ডুবিয়ে দাও। আমার মধ্যে যে কাদামাটি সেটাকে ধোয়ার জন্য আমাকে আর ডোবাতে পারবো না, যিনি আমাকে টানবেন এটা তাঁকেই করতে হবে। টানার হলে তিনিই ডুবিয়ে আমার গোলমালগুলো সারিয়ে নেবেন।

ভক্ত সাধনা যেমন যেমন করবে, সাধনা মানে সকাল সন্ধ্যা দিনে দুবার একশ আটবার জপ করা নয়। একটা উপাচারকে ধরে রাখার জন্য এটারও দরকার আছে। এই উপাচার মূলক সাধনার কথা এখানে বলা হচ্ছে না, যখন সত্যিকারের সাধনা শুরু করা হয় তখন সেই ভক্তের উপর আর তার পারিপার্শ্বিকের উপর এমন অনেক কিছু ঘটনা ঘটতে শুরু হবে, তখন ভক্তের মনে হবে সত্যিই এগুলো আমি করছি। বড় বড় জ্যোতিষিরা মানুষের কোষ্ঠি বিচার করে বলে তার এই এই ক্ষেত্রে এই এই গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব থাকায় তার এই এই বিপদ বা ভালো হওয়ার সম্ভবনা আছে। গ্রহ নক্ষত্র অত্যন্ত সাধারণ জিনিষ, এরা সবাই প্রকৃতির এলাকার। কিন্তু এই গ্রহ নক্ষত্রের কাছেই যদি আমরা এত অসহায় তখন আমাদের সেখানে অহঙ্কার করার মত কি কিছু আছে? যদি গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবেই সব কিছু ভালো মন্দ আমাদের জীবনে হয়ে থাকে তাহলে আমার আমি বোধ বা আমি কর্তা এই বোধের কোন দামই নেই। এটাই যখন সাধনা করে করে মন যখন একটা স্তরে চলে যায়, তখন দেখে আমি ভাবছি আমি সব কিছু করছি কিন্তু সবই তো এই গ্রহ নক্ষত্রই করাচ্ছে। যে খুন করছে তার গ্রহগুলো এমন ভাবে রয়েছে যার জন্য তাকে দিয়ে খুন করাচ্ছে। কিন্তু এর পরেও সাধনা করে করে যখন প্রকৃতির এলাকাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে, তখন দেখে আমরা পুতুল ছাড়া কিছুই নয়। গীতায় ভগবান বলছেন *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়নসর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।* ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করে আমাদের সবাইকে পুতুলের মত নাচাচ্ছেন, আমার আমি বলতে কিছু নেই, সবই তিনি। সমস্যা হল, আমরা এত নিম্ন স্তরে পড়ে আছি যে এই বোধ আসা অত্যন্ত কঠিন। আবার ঈশ্বরের প্রতি যখন ভক্তি জাগে, ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণের ভাব উদয় হয় তখন ঠাকুর তাকে কিভাবে যে নিয়ে যান বোঝা খুব মুশকিল। যেটা ভালো মনে করছি সেটাকে তিনি মন্দ করিয়ে দেবেন, যেটাকে মন্দ বলছি সেটাকে ভালো করিয়ে দেবেন। ঠাকুর খুব সহজ করে বলে দিলেন যখন সত্যিকারের শরণাগতির ভাব ভেতরে আসে তখন তার বেড়াল ছানার ভাব হয়। মা কখন তাকে হেঁসেলে রাখছে, কখন বিছানায় রাখছে কখন আবার ছাইয়ের গাদায় রাখছে। মাই জানে তার কিসে ভালো কিসে মন্দ, তাকে এলাকাটা ঘুরিয়ে পরিশ্রম করিয়ে নিচ্ছেন।

এক ধনীলোকের তিনটে সন্তান, আর তিনটে সন্তানই অকর্মা। বাবা মারা যাবার অনেক বছর পর তাদের বাড়িতে একজন সাধুবাবা এসেছেন। বাবার আমল থেকেই এই সাধুবাবা আসতেন আর তাঁকে খুব খাতির যত্ন করা হত। অনেক

দিন পরে সাধুবাবা এসে দেখেন এদের বাড়িটা সেই রকমই আছে আর বাবার আমলের সেই আম গাছটাও আছে। কিন্তু সব কিছুই শ্রীহীন হয়ে গেছে। এই তিনটে ছেলেরই মাথায় আছে বাবার সময়ে এই সাধুর খুব খাতির যত্ন করা হত। সাধুবাবা এসে পড়েছেন। তাকে এখন খাতির যত্ন করতে হবে। কি ভাবে করা যায়? এরা তাড়াতাড়ি রাত্রিবেলা আম গাছে কিছু আম পেড়ে নিয়ে বিক্রী করে একজনের মত কিছু চালডাল কিনে সাধুবাবার সেবা করেছে। সাধুবাবা জিজ্ঞেস করছে তোমরা খাবে না? প্রথম জন বললে আমি নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছি, দ্বিতীয় ভাই বলল আমার আজ অমুক উপোস আছে আর তৃতীয় জন বলল আমার শরীর খারাপ। আসলে ঘরে কিছুই খাবার নেই খাবে কি! সাধুবাবা সব বুঝতে পেরেছেব। উনি মাঝ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে গিয়ে আম গাছটাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। এমন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে যে আম গাছটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সাধুবাবা ঘরে এসে আবার যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছেন। সকালবেলা সবাই ঘুম থেকে উঠে দেখে আম গাছটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ছেলেগুলো খুব কান্নাকাটি করেছে। সাধুবাবা কাউকে কিছু না বলে চলে গেছেন। কয়েক বছর পর সাধুবাবা আবার ঐ বাড়িতে এসেছেন। এসে দেখছেন ওদের অবস্থা আগের থেকে অনেকটাই ভালো হয়ে গেছে। এদের একটাই সম্বল ছিল ঐ আম গাছটা। সাধুবাবা সেটাকেই পুড়িয়ে দিয়ে গেছেন। এখন বাধ্য হয়ে তারা কাজকর্মে নেমে পড়েছে। কাজে কর্মে যখন নেমে পড়েছে তখন কাজ করে খেটেখুটে আবার তাদের আগের স্বচ্ছল অবস্থাটা দাঁড় করিয়েছে। এবারও সাধুবাবাকে খাতির করে নিজেরাও খেতে বসেছে। সাধুবাবা তখন তাদের বললেন 'আমিই ঐ আম গাছটাকে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা ঐখান থেকে বেরিয়ে আসতে পার'। এই আম গাছটা যে পোড়ান হল এতে ভালো হল কি মন্দ হল কে বলবে? এই কাহিনী সত্যি হতে পারে, মিথ্যে হতে পারে আবার কল্পনাও হতে পারে, কিন্তু যিনি এই কাহিনীটা তৈরী করেছেন, তাঁর চিন্তা-ভাবনা কি রকম সেটা আমরা ধারণা করতে পারি। যখন কোন অঘটন ঘটে তখন সেই অঘটন থেকে কি ভালো বেরিয়ে আসবে আমাদের পক্ষে বলা অসম্ভব। এই ধরণের ঘটনা দিয়েই বোঝা যায় ঈশ্বর কাকে দিয়ে কি করাতে চাইছেন। সাধক যখন জপ-ধ্যান করে, শাস্ত্রপাঠ করে সাধনা করছে তখন সে ঈশ্বরকে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু একটা অবস্থায় যখন সাধক আধ্যাত্মিক রাজ্যে ঢুকে পড়ে তখন ঈশ্বর তাকে ধরে নেনে। ধরে নেওয়ার পর ঈশ্বর যে কত রকম জ্বালা যন্ত্রণা দিতে শুরু করবেন ধারণাই করতে পারা যায় না। কিন্তু এই জ্বালা যন্ত্রণাটাই শুদ্ধিকরণের পথ। যতক্ষণ না মানুষ আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ না করছে ততক্ষণ এই জ্বালা যন্ত্রণা আসবে না। কারণ তিনি তাকে শুদ্ধি করতে শুরু করেন, এই শুদ্ধি মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের ভালো মন্দ যা কিছু হয় সেটা প্রকৃতির নিয়মনাসুরে হয়। মহাভারতে মাঙ্কি গীতাতে মাঙ্কি বলে একজন লোক অর্থ রোজগারের জন্য নানা রকমের পরিকল্পনা করে যাচ্ছে, যেটাই প্ল্যান করে সেটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। বিরক্ত হয়ে শেষে সব টাকা-পয়সা যা সম্বল ছিল তাই দিয়ে দুটো বাছুর কিনল, সেই বাছুর দুটোকে আবার একটা দুর্ঘটনায় উটে নিয়ে পালিয়ে গেছে। তখন শেষে হতাশ হয়ে সে বলল, জীবনে তৃষ্ণা ছাড়া আর কিছু নেই, আমি এবার ভগবানের পথে চললাম। এতক্ষণ তার যে একটার পর একটা মন্দই হয়ে চলেছিল, ঠাকুর বলবেন এগুলো তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলো হয় প্রকৃতির নিয়মে। এরপর যখন ঈশ্বরের পথে ঢুকে পড়ল, বেড়ালের মা তার ছানাকে যেমন ঘাড়ে ধরে যেখানে খুশি রাখছে, তখন এই প্রক্রিয়াটা তার উপর শুরু হয়। এইটাই হল শুদ্ধিকরণ। চীরহরণে ঠিক এটাই করা হয়েছে। ঠাকুর বলছেন লজ্জা, ঘৃণা আর ভয় এই তিনটে থাকলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হয় না। গোপীদের ঘৃণা বলে কিছু ছিল না, কারণ তাদের ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ছিল। বিষয়ী লোকেদের ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা থাকতে পারে, কিন্তু গোপীদের ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ছিল বলে তাদের মধ্যে ঘৃণার ভাব ছিল না। কিন্তু ভালো করে যদি বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে গোপীদের মধ্যে দুটো সমস্যা ছিল, লজ্জা আর ভয়। লজ্জা নিবারণ চীরহরণে করা হয়েছে আর ভয় নিবারণ রাসলীলাতে হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি গোপীদের ঘৃণার ভাব ছিল না, ঘৃণা ছিল শিশুপালের, জরাসন্ধের, কংসের। এরা কোন দিন শ্রীকৃষ্ণকে পাবেনা। গোপীদের এই সমস্যাটা ছিল না। কিন্তু গোপীদের সমস্যা ছিল লজ্জা আর ভয়ে। শ্রীকৃষ্ণের সামনে আসার যে লজ্জা ভাব এটাকে চীরহরণে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি ভগবানের সামনে বিবস্ত্র এসে দাঁড়িয়েছি, আমার তো সবই চলে গেছে, তুমিই একমাত্র আমার রইলে।

গোপীদের ইচ্ছে ছিল শ্রীকৃষ্ণে যেন তাদের পূর্ণ আত্মসমর্পণ হয়, কিন্তু লজ্জা তাতে বাধা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেটাকে সরিয়ে দিলেন। ঘোর অধ্যাত্মবাদীরা যখন যোগের দৃষ্টিতে ব্যখ্যা করেন তখন তাঁরা বলেন, শ্রীকৃষ্ণ হলেন আত্মস্বরূপ আর গোপীরা হলেন বুদ্ধিবৃত্তি। বৃত্তি হল, পুকুরের শান্ত জলে যখন কোন পাথর ছুঁড়ে দেওয়া হয় তখন পুকুরের জলে ঢেউ উঠতে থাকে। এই ঢেউয়ের জন্য পুকুরের জলের নীচে কি আছে জানা যায় না। এই বৃত্তিগুলো যখন শান্ত হয়ে যায় তখন বলছেন *তদাদ্রুষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্*, যিনি দ্রষ্টা তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন। যোগশাস্ত্রের মতে বৃত্তি পাঁচ রকমের আর বৃত্তি শান্ত হয়ে যাওয়া মানে আত্মদর্শন। গোপীদের বৃত্তি যেটা ছিল সেটাই হল তাদের আবরণ। ঐ আবরণটা শান্ত হয়ে গেল, এবার আত্মস্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ আর যে বৃত্তি এই দুটো এক হয়ে গেছে। বৃত্তি নাশ মানে গোপী আর কৃষ্ণ এক হয়ে গেছে। এই শুদ্ধ

আত্মাতে যখন রমণ করা হয় সেটাই তখন রাস হয়ে যায়। বৃত্তি মানে বুদ্ধিতে যখন ঢেউ উঠছে তখন জল আর ঢেউ আলাদা, জলের সঙ্গে এক হতে পারছে না। জল আর ঢেউ আলাদা বোধ হয়। ঢেউ শান্ত হয়ে যাওয়া মানে যারা গোপী তারা জলের সঙ্গে এক হয়ে গেল। এটাই রাস।

ভাগবতে গোবর্ধন পর্বত ধারণ পর্বের পরই আসে রাসলীলা। পর পর পাঁচটি অধ্যায় নিয়ে রাসলীলা। রাসলীলার উপর বিভিন্ন ভাষ্যকাররা যে ভাষ্য দিয়েছেন তার উপর সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার। রাসলীলার পাঁচটি অধ্যায়কে বলা হয় শ্রীমদ্ভাগবতের পাঁচটি প্রাণ। প্রত্যেক প্রাণির শরীরে পাঁচটি প্রাণ চলে – প্রাণ, অপান, উদান, ব্যায়ান ও সমানা। আমাদের শরীরের যত রকমের প্রাণিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, নিঃশ্বাস নিচ্ছি, প্রশ্বাস ছাড়ছি, নিঃশ্বাস নেওয়ার পর সেই বায়ু শরীরের বিভিন্ন অংশে ঘুরে ঘুরে কাজ করছে, ঢেকুর তুলছি, হজম করছি ইত্যাদি যত রকমের ক্রিয়া হচ্ছে, বলা হয় পাঁচ রকমের উর্জা বা শক্তি দেহে কাজ করছে। আমাদের শরীরে মূল যে শক্তি যাচ্ছে সেটা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে যায়। চার দিন না খেয়ে থাকলে, চার দিন জল না খেয়ে থাকলে কেউ মরে যাবে না। কিন্তু নিঃশ্বাস যদি কয়েক মিনিট বন্ধ থাকে আমরা মরে যাব। এই সিলিং পাখাটা ঘুরছে কারণ এর মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে, শক্তি প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে পাখা ঘোরাটা বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের শরীরে শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে বলে শরীরটা কাজ করছে। আমাদের শরীরের পাঁচ রকমের শক্তি আছে। এই পাঁচ প্রকার শক্তির মূল হল বাতাস। এই বাতাস যখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালীতে চলাচল করে তখন এই পাঁচটি শক্তির উপর খেলা করতে করতে কাজ করে। সব সময় যে বাতাস হিসাবে কাজ করছে তা নয়, পাঁচ রকম শক্তির মাধ্যমে কাজ করে। এই শক্তিকে বলা হয় প্রাণ। স্বামীজী যখন সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন সেখানে তিনি বারবার আকাশ ও প্রাণ এই শব্দ দুটো বলছেন। স্বামীজী প্রাণকে অনুবাদ করছেন energy বলে। আমরা প্রাণকে সাধারণত বলি প্রাণ বায়ু। কিন্তু প্রাণ বায়ু আর প্রাণ দুটো আলাদা। পঞ্চপ্রাণ বলতে বোঝায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে যখন শক্তি শরীরের মধ্যে যাচ্ছে আর পাঁচটি প্রক্রিয়াতে কাজ করে তখন তাকে বলা হয় পঞ্চপ্রাণ। পঞ্চপ্রাণের যে কোন একটির যদি সাম্য ভাব নষ্ট হয়ে যায় তাহলে শরীরে নানান রকমের গণ্ডগোল দেখা দেবে। আর প্রাণবায়ুকে যদি টেনে বার করে নেওয়া হয় তাহলে সে মারা যাবে। মৃত্যু মানেই প্রাণবায়ু চলে যাওয়া। রাসলীলার এই পাঁচটি অধ্যায় হল ভাগবতের পঞ্চপ্রাণ। একটা মানুষের প্রাণটুকুই তো তার পরিচয় নয়, প্রাণ ছাড়াও তার অনেক কিছু আছে, মাথা আছে, হাত আছে, নাক-কান-চোখ আছে। ঠিক তেমনি ভাগবতে সব কিছুই আছে, তার দেহ আছে, ইন্দ্রিয় আছে কিন্তু এই পাঁচটি অধ্যায় পাঁচটি প্রাণ। ভাগবত থেকে এই পাঁচটি অধ্যায়কে যদি বার করে নেওয়া হয় তাহলে ভাগবতের সমস্ত তাৎপর্যই নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ভাগবতে বাকি যা কিছু আছে, সৃষ্টি তত্ত্ব, দর্শন তত্ত্ব এবং অন্যান্য বর্ণনা যা আছে এগুলো অন্য গ্রন্থেও আমরা পেয়ে যাব। কিন্তু রাসলীলা, যেটা এই পাঁচটি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

রাসলীলায় কি কি আছে? শ্রীকৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গলীলার বর্ণনা আছে। যে কোন মানুষের লীলা দুই রকমের হয়, একটা হয় বহিরঙ্গ আরেকটি হয় অন্তরঙ্গ। আমরা প্রায়ই অপরকে বলি 'তুমি হলে একটি দুমুখো সাপ, তোমার বাইরে এক রকম ভেতরে অন্য রকম'। কিন্তু বাইরে আর ভেতরে কখন এক রকম হয় না। একই রকম থাকে একমাত্র পাগল আর মহামুর্খের। বাকী সবারই ব্যবহার দুই রকম থাকে। মহাপুরুষদের দুই রকম ব্যবহার অবশ্যই থাকবে। ঠাকুর নরেন রাখালকে যা বলতেন বাইরের লোকদের সেই কথা বলতেন না। অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ থাকবেই। সেইজন্য কেউ যদি বলে 'তুমি দুমুখো সাপ, তোমার বাইরের আর ভেতরটা আলাদা'। তার মানে, সে স্বাভাবিক। যদি এক রকম হয় তাহলে বুঝতে হবে তোমার ভেতরে গোলমাল আছে। মহাপুরুষদের ঠিক ঠিক যে তাঁর ব্যক্তিত্ব, সেটা বেরোয় তাঁর অন্তরঙ্গ যাঁরা তাঁদের সামনে। শ্রীকৃষ্ণের ঠিক ঠিক ব্যক্তিত্ব হল তাঁর পরম দিব্য ভাব। শ্রীকৃষ্ণের এই পরম দিব্য ভাব কোথায় গিয়ে বেরোচ্ছে? পরম অন্তরঙ্গ লীলাতে। পরম অন্তরঙ্গ মানে, যিনি অন্তরঙ্গেরও অন্তরঙ্গ। ঠাকুরের পরম অন্তরঙ্গ হলেন নরেন রাখাল। ঠাকুর নরেন নরেন করে যাচ্ছেন। কথামৃতে আর কারুর জন্য ঠাকুরকে এই রকম ছটফট করতে দেখছি না। যেমন শ্রীকৃষ্ণের রাধা ঠিক তেমনি ঠাকুরের হল নরেন, নরেন ঠাকুরের অন্তরঙ্গেরও অন্তরঙ্গ। এই অন্তরঙ্গের তল আমরা খুঁজেই পাব না। এই ভালোবাসা যে কোন স্তরের আমরা কল্পনাও করতে পারব না।

রাসলীলাতে আর কি আছে? ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ। কার কাছে প্রকাশ হচ্ছে? যিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গ। এই অন্তরঙ্গলীলার সাথে আর কি আছে? দিব্যাতিদিব্য ক্রীড়া। দিব্য থেকেও দিব্য ক্রীড়া। কার সঙ্গে? গোপীদের সাথে। গোপীরা কারা? ভাষ্যকাররা বলছেন, নিজ স্বরূপভূতা। নিজ স্বরূপভূতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ, তাঁর নিজেরই স্বরূপ। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের থেকে আলাদা নন। আমি একটা ঘরের মধ্যে আছি, সেই ঘরে বিভিন্ন ধরণের আয়না টাঙানো আছে, কোনটা ডিম্বাকৃতি, কোনটা গোলাকৃত, কোনটা লম্বাকৃতি দেখায় আবার সাধারণ প্লেন আয়নাও আছে। সব কটি আয়নাতে আমারই

বিভিন্ন রকমের প্রতিবিম্ব হচ্ছে। একটা প্রতিবিম্বের কাছে গিয়ে বলছি 'বাঃ আমাকে বেশ রোগা দেখাচ্ছে'। আবার একটাতে মোটা দেখাচ্ছে, কোনটাতে বেঁটে, কোনটাতে গোল দেখাচ্ছে। কিন্তু সেই একই লোক। আয়না এখানে একটা উপমা হিসাবে নেওয়া হল। কিন্তু এখানে নিজ স্বরূপভূতা। যেমন আমার নিজের প্রতিবিম্ব হাজারটা আয়নাতে দেখাচ্ছে, ঠিক তেমনি হাজারটা গোপীরা হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব। উপমাতে একটা জিনিষের উপমা আরেকটা জিনিষে নিতে গেলে অনেক রকমের সমস্যা এসে যায়। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন নন, তিনিই নানান রকমের শরীর ধারণ করেছেন, তিনিই তাঁর নিজের সাথে ক্রীড়া করছেন। সাধক কবি বলছেন 'আপনি করিলে আপনার পূজা আপনার স্তুতি গান'। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাতে এই একই জিনিষ হচ্ছে এখানে একটু অন্য ভাবে বলতে হবে 'আপনি করিলে আপনাকে প্রেম'। গোপী আর শ্রীকৃষ্ণ আলাদা নন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে নিজেকেই ভালোবাসছেন। আজ পর্যন্ত কেউ কাউকে ভালোবাসেনি, ভালোবাসতে পারেই না, সম্ভবই নয়। নিজেকে ছাড়া মানুষ কক্ষণই কাউকে ভালোবাসে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যকে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞেস করছেন মানুষ স্ত্রী, পুত্র, ধন সম্পদকে কেন ভালোবাসে? যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন 'সেখানে মানুষ নিজেকে দেখে, আত্মার প্রকাশকে সে দেখে। মানুষের কথা বাদ দিন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলছেন 'ভক্তকে আমি ভালোবাসি'। কেন? *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্*, জ্ঞানী হল আমার আত্মা। এখানেও আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন মানুষ একমাত্র তার আত্মাকেই ভালোবাসে। যতক্ষণ মনে করবেন ইনি আর আমি এক ততক্ষণই ভালোবাসা। স্বামীজী সুফি কবির কবিতা থেকে বলছেন প্রেমিক প্রেমিকার দরজায় করাঘাত করছে। ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করছে 'কে'? বাইরে থেকে উত্তর আসছে 'আমি'। দরজা খুলল না। আবার দরজায় করাঘাত। আবার প্রশ্ন 'কে'? কিছুক্ষণ পরে 'আমি'। দরজা খুলল না। আবার দরজায় করাঘাত। 'কে'? এবার বলছে 'তুমি'। দরজা খুলে গেল। যেখানে আমি তুমি আছে সেখানে ভালোবাসা হতে পারেনা। ভালোবাসা একমাত্র সেইখানেই যেখানে শুধু আমি আমি আছে বা শুধু তুমি তুমি। যে আমি, একমাত্র আমিই আছি বলছে সে জ্ঞানী। যখন বলে তুমি তুমি, তুমিই আছ তখন সে ভক্ত। জ্ঞানীর ক্ষেত্রেও আমি তুমির ভেদ মিটে গিয়ে শুধু আমি থাকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। ভক্তের ক্ষেত্রে সেটাই তুমি তুমি তুঁহু তুঁহু হয়ে যায়, ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই নেই। এই আমি তুমি ভেদ যেটা আচার্য ব্রহ্মসূত্রে বলছে যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়, আমি আছি আর এই বই আছে, আমি আর তুমি আলাদা পরিষ্কার দেখছি, এই ভেদ দৃষ্টি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কখনই ভালোবাসা যায় না।

ঠাকুর বলছেন যতক্ষণ আমি বোধ থাকবে ততক্ষণ তুমি বোধটাও থাকবে। যখন তুমি বোধ আছে তখন আমি আর তুমি সমান নয় এই বোধটাও থাকতে বাধ্য। সমান না হলে একজন বড় একজন ছোট হবেই। এগুলো জানার জন্য খুব বিরাট কিছু পণ্ডিত হতে হবে না। একটা গরুও জানে সে আর ঘাস আলাদা। মাধ্বাচার্য যখন বলছেন, ভগবান আছেন আর তাঁর সৃষ্টি আছে, ভগবান আর জীব কখন এক হন না। এইটা বোঝার জন্য কিসের এত দর্শন পড়তে হবে কিন্তু তিনি যুক্তি দিয়ে এইগুলোকে বিশেষ ভাবে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর যুক্তির কাছে বড় বড় পণ্ডিতরাও দাঁড়াতে পারছেন না। কিন্তু অন্য দিকে সহজাত ধারণা থেকে বোঝা যাচ্ছে কোথাও একটা গোল আছে। কারণ যে শাস্ত্র আধার করে মাধ্বাচার্য বলছেন ভগবান আর জীব কোন দিন এক হবে না, সেই শাস্ত্রই আবার অন্য রকম কথা বলছে। যেমন এখানে বলছে নিজ স্বরূপভূতা। বিষয়ী লোক যখন দেখছে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে লীলা করছেন তখন সে যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয় নিয়ে দেখছে, তার আমি তুমি ভেদ আছে, গোপী আলাদা শ্রীকৃষ্ণ আলাদা। কিন্তু যখন বলছেন নিজ স্বরূপভূতা, তখন কে কার সঙ্গে লীলা করছে? হয় আমি আমি খেলা চলছে আর তা নাহলে তুমি তুমি খেলা চলছে। তাহলে এখানে ভেদ দৃষ্টি বা দ্বৈতবাদ কোথা থেকে আসছে? দ্বৈতবাদ যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই ভিত্তিটা কোথায়? সেইজন্য ঠাকুর সহজ করে বলে দিলেন যতক্ষণ দেহবুদ্ধি আছে ততক্ষণ আমি বোধ থাকবে, আমি বোধ মানেই তুমি বোধ আসবে, আমি তুমি বোধ মানেই অসমান বোধ, অসমান বোধ মানে একটা বড় একটা ছোট বোধ। ঈশ্বর থাকলে তার ভক্ত থাকবে। কিন্তু দেহবোধ যদি চলে যায়? মানুষ যখন খুব প্রিয় খাবার পেয়ে খেতে থাকে তখন তার দেহবোধ চলে যায়। এই খাবার খেয়ে আগে আমার শরীর খারাপ করেছিল তখন সেই কথাও মনে থাকে না। ঠিক তেমনি নিজের অত্যন্ত প্রিয়তমকে যখন কাছে পায় তখন দেহবোধ থাকে না। দেহবোধ যখন চলে গেল তখন মূল আমি বোধ সেটাই উড়ে গেল। আমি তুমি ভেদ থাকবে না, এইটাই তো অদ্বৈত। এখানে আমি তুমি নেই এখানে নিজ স্বরূপভূতা। নিজের স্বরূপের বাইরে কিছু নেই।

শুধু তাই নয়, হ্লাদিনী শক্তি, আনন্দের স্রোত আর তার সাথে চলছে দিব্যাতিদিব্য ক্রীড়া। শ্রীরাধিকাও আছেন আর গোপীরাও আছেন। ভক্তরা বলে বৃন্দাবনের নিধুবনে নিশীথ রাতে এখনও নাকি নিত্য রাস অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এই নিত্য রাসের ব্যাপারে লোকেরা বলে আগেকার দিনে রাত্রে মানুষ নিধুবনের দিকে তাকাত না। বিষয়ীরা যদি তাকায় তাহলে সে অন্ধ হয়ে যাবে। নিধুবনে যারাই পরিক্রমা করে তাদের এই ভাব। এখানে নিত্য রাস হয়ে থাকে।

রাস শব্দের অর্থ এসেছে রস থেকে। শ্রীকৃষ্ণই রস। উপনিষদেই বলা হয় ***রসো বৈ সঃ***, ভগবান তিনি হচ্ছেন রস। আনন্দই সব কিছুর মূল। মানুষ যা কিছু করে আনন্দ পাওয়ার জন্যই করে। মানুষ এত গরু খাটার মত পরিশ্রম করে, ঠাকুর বলছেন সাহেবের বুটের গোঁতা খেতেই থাকে। কেন করছে? আনন্দের জন্যই খেটে মরে। আনন্দের জন্য চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। একদিকে দেখা যায় মানুষ চাঁদে চলে যাচ্ছে, মঙ্গল গ্রহে উপগ্রহ পাঠাচ্ছে আবার অন্য দিকে একটা পাগল লাঠি নিয়ে সারাদিন মাটির ভাঁড় ভেঙে বেড়াচ্ছে। কেন? শুধু আনন্দের সন্ধানে। যখন বুঝে নেয় কোন কিছু থেকে আমি আর আনন্দ পাবো না, তখনই মানুষ আত্মহত্যা করে। পরিসংখ্যানে বলছে ভারতে গড়ে প্রত্যেক আট মিনিটে একজন করে আত্মহত্যা করে। যারা আত্মহত্যা করছে তারা ভাবছে আমি আর আনন্দ পাবো না, তারাও তখন ভাবছে আমার মৃত্যুতেই আমার আনন্দ। কেন আনন্দের সন্ধানে মানুষ ছুটে বেড়াচ্ছে? রসো বৈ সঃ। আমার ভেতরে যিনি ঈশ্বর আছেন তিনি রসস্বরূপ, তিনি আনন্দস্বরূপ। যেখানেই আনন্দ সেখানেই ঈশ্বরের প্রকাশ। রামপ্রসাদ বলছেন মা গো আনন্দময়ী নিরানন্দ করো না। আনন্দময়ী মা যদি ভেতরে বিরাজ করেন তখন নিরানন্দ থাকবে না। স্বামীজী বলছেন – আধ্যাত্মিক পুরুষ যাঁরা হন তাঁদের কখন গোমড়া মুখ থাকে না।

যখন এই রস সমূহ, যত রকমের রস হতে পারে সব রসকে যখন এক জায়গাতে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আর তার সাথে ভগবান নিজেই যখন আস্বাদীয়াত্তাস্বাদৎ, সেটাই তখন রাস হয়ে যায়। রাসের উৎস হচ্ছে রস, রস মানে ভগবান। তারপর যত রকমের রস হতে পারে সব রস যখন এক জায়গাতেই জমা হয় তখন তাকে বলা হয় রাস। একটা যুবক ছেলে একটি যুবতী মেয়ের হাত ধরে পার্কে ঘুরছে। এটা কি তখন রাস হবে? কখনই হবে না। কেন হবে না? এই যে এখানে প্রেমরস সঞ্চারিত হচ্ছে, যখন ভগবান নিজে এই রসের আস্বাদক হবেন তখনই সেটা রাস হবে। এর সঙ্গে আর কি বৈশিষ্ট্য? যেটাকে আস্বাদ করা হচ্ছে সেটাও তিনি নিজে। আমি যখন ভোজন করি তখন আমি আর খাদ্য পুরো আলাদা অর্থাৎ আমি আস্বাদক আর আস্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু রাসে যে রস আস্বাদ করা হচ্ছে তাতে ভগবান নিজেই আস্বাদক মানে যে জিনিষটাকে আস্বাদ করা হচ্ছে আর যে জিনিষটাকে আস্বাদ করা হচ্ছে সেটাও তিনি। মানে গোপীরাও তিনি আর যিনি লীলা করছে সেটাও তিনি এবং যে লীলাটি হচ্ছে সেটাও তিনি। কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া তিনটেই এক। যে কোন কাজের জন্য এই তিনটি দরকার, কর্ম তিনি, কর্তা তিনি আর যে ক্রিয়া হচ্ছে সেটাও তিনি আর পুরোটাই রস। সেইজন্য একে বলা হচ্ছে রাস। তার সাথে উদ্দীপক, যে লীলা হচ্ছে, যে স্থানে হচ্ছে আর নানা রকমের যে আলম্বন এবং তার সঙ্গে যে উদ্দীপন হচ্ছে সবটাই তিনি। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদের সঙ্গে রাস করছেন তখন তাতে আলম্বন আর উদ্দীপন দুটোরই দরকার, এই দুটোর যা কিছু হচ্ছে এগুলো সবই রসের ক্রীড়া। এর সবটাই একত্রে রাসলীলার মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়েছে। রসের যে পরাকাষ্টা তার সবটাই এই রাসলীলার মধ্যে ঢালা আছে। ঢেলে সবটাই এক হয়ে গেছে। কোথাও কোন ভেদ বুদ্ধি নেই।

কথামৃতে ঠাকুর এই ভাগবতের কথাই উল্লেখ করে বলছেন – কৃষ্ণ অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। গোপীরা তখন কৃষ্ণকেই নকল করছেন 'ওরে আমি কৃষ্ণ হয়েছি'। গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমে এমন তন্ময় হয়ে গেছেন যে বলছেন আমি কৃষ্ণ হয়েছি। কৃষ্ণের প্রতি এমন ভালোবাসা যে তাঁদের কোন হুঁশ নেই। ভগবানের এই দিব্যলীলা সব সময়ই হয়ে চলেছে। কারণ আমরা তো ভগবান থেকে আলাদা নই। আমার যা কিছু হচ্ছে তিনিই সব কিছুকে আস্বাদ করছেন। অনন্ত যিনি তিনিই সান্ত রূপের মাধ্যমে সেই অনন্তকেই আস্বাদ করছেন। যদিও এই আস্বাদন নিরন্তর হয়ে চলেছে তবু মাঝে মাঝে তাঁর বিশেষ লীলা সংঘটিত হয়। এই বিশেষ লীলার সময় বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ভক্তের সাথে একটি বিশেষ লীলা হয়। রাসলীলা ঠিক তাই।

বক্তা ভাষণ দিচ্ছেন শ্রোতারা শুনছেন। বক্তা যখন ভাষণ দিচ্ছেন তখন তিনি একটা আনন্দের অনুভূতি পাচ্ছেন, শ্রোতারা শুনছেন তাঁরাও একটা আনন্দের অনুভূতি পাচ্ছেন। আনন্দের অনুভূতি তো একই জিনিষ, আনন্দ মানে রস, রস মানে রসো বৈ সঃ। যেখানেই এইভাবে ঈশ্বরের লীলা হয় সেটাই রাস। ঈশ্বরের লীলা নিরন্তর হয়ে চলেছে। কখনই এমন অবস্থা হয় না যে ঈশ্বরের লীলা হচ্ছে না। কারণ মানুষ যা কিছু করছে, পশুপাখি যা কিছু করছে সবাই আনন্দের জন্যই করছে। গরু সবুজ কচি কচি ঘাস খাচ্ছে আনন্দের জন্যই, উট কাঁটা ঘাস খাচ্ছে আনন্দের জন্যই। মানুষ বিয়েথা করছে আনন্দের জন্য, সেই মানুষই গলায় দড়ি দিচ্ছে আনন্দের জন্যই। যখন রসগোল্লা খাচ্ছে তখনও আনন্দের জন্য আবার মদ খেয়ে যখন নেশাগ্রস্ত হচ্ছে তখন সেটাও আনন্দের জন্য। তাই লীলা নিরন্তর হয়ে চলেছে। সবটাই ঈশ্বরের লীলা। কিন্তু কিছু কিছু বিশেষ লীলা হয় যেটা বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ জায়গায় বিশেষ লোকের সঙ্গে হয়, সেটাকে তখন বলা হয় রাসলীলা।

যখন সাধারণ ভাবে কেউ কাজ করে আমরা তখন বলি অমুক লোক কাজ করছে। জগতের সব কিছুকে নাম ও রূপ দিয়ে জানা হয়। ঐ নাম রূপটাও ঈশ্বরেরই নাম ও রূপ। কিন্তু কখন সখন ভগবান সাক্ষাৎ দিব্যধাম থেকে নেমে এসে

শরীর ধারণ করে কিছু এমন লীলা করেন, যে লীলাকে স্মরণ করে, মনন করে উচ্চ আধ্যাত্মিক অধিকারী পুরুষ নিজের আধ্যাত্মিক চেতনার স্তরকে আরও উপরের দিকে নিয়ে চলে যান। এর ভালো নিদর্শন আমরা কথামৃতে সুন্দর পাই। কথামৃতে বর্ণনায় দেখা যায় ঠাকুর গোপীদের কথা বলছেন, গোপীদের কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু বেরিয়ে আসছে। গভীর ভাবে দুই এক ঘন্টা জপ করার পর যদি কেউ কথামৃত পড়ে যেখানে ঠাকুর উদ্দাম নৃত্য করছেন আর গোপীদের কথা বলতে বলতে 'হে কৃষ্ণ, হে প্রাণবল্লভ' উচ্চারণ করতে করতে তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে, তখন তার একটা আলাদা অনুভূতি হবে। রাসলীলাকে ঠাকুর উল্লেখ করে নিজের অনুভূতিকে সেই অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছেন গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমে যে অবস্থায় চলে গিয়েছিল। ভাগবতের ভাষ্যকারদের ঠাকুরের কথা জানার কথা নয়, কিন্তু বলছেন যাঁরা উচ্চ আধ্যাত্মিক অধিকারী অর্থাৎ যাঁরা জ্ঞান ভক্তির উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন, তাঁরা এই রাসলীলার মত দিব্য ঘটনাকে যখন স্মরণ করেন তখন তাঁর চেতনার অবস্থাটা অনেক উপরে চলে যায়। রাসলীলা মুষ্টিমেয় কয়েকজন উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য। রাসলীলার মত ঈশ্বরীয় দিব্যলীলা জনসাধারণের জন্য নয়। সুফিরাও বলে যে যারা chosen few, যাদের সিলসিলা অর্থাৎ পরম্পরা আছে তারাই হল সুফি দরবেশ। ঠিক তেমনি রাসলীলা মুষ্টিমেয় কয়েকজন নির্বাচিত ভক্তের জন্য। সাধারণ মানুষ অশুদ্ধ মন দিয়ে রাসলীলাকে ভৌতিক দৃষ্টিতে দেখবে। অথচ রাসলীলা স্মরণ করে যখন ঠাকুরের নৃত্য স্বামীজীর মত লোক দেখছেন তখন তিনি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। সেই স্বামীজীর মত লোক চিকাগোতে ভাষণ দিচ্ছেন, উচ্চ দর্শনের তত্ত্ব দিচ্ছেন, সেটাকে পাঠ করে আমরা আবার নিজেদের বর্তমান অবস্থাকে উন্নীত করছি। এইভাবে রাসলীলার আনন্দ ঠাকুর স্বামীজীর মাধ্যমে ঘুরে ঘুরে আমাদের স্তরে চলে আসছে। সেইজন্য বলছেন মানুষ যখন আধ্যাত্মিক জীবনে কৃতকৃত্য হতে চায় তখন ঈশ্বরকে কেমন ভালোবাসতে হবে, কারণ জ্ঞান আর ভক্তিতে কোন তফাৎ নেই, ঈশ্বরের সাথে কেমন রমণ করবে, গোপীরা যেমন কৃষ্ণের সাথে রমণ করেছিলেন, এই আধ্যত্মিক অনুভূতি স্তরকে ধারণা করে তাকে আস্বাদন করার জন্যই রাসলীলার বর্ণনা।

এই পাঁচটি অধ্যায়ে কি কি আছে? এতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বণি, অভিসার, মিলন, দর্প, রমণ, অন্তর্ধান, পুনঃ প্রাকট্য এই ধরণের নানা জিনিষের সাথে গোপীরা নানা রকমের প্রশ্ন করছেন, রাসনৃত্য, ক্রীড়া পাওয়া যাবে। এই যা কিছু হচ্ছে সব আমাদের ভাষায় বর্ণিত হচ্ছে, ভাষাটা আমাদের কিন্তু এগুলো সবই দিব্য। একটা দিব্য জিনিষকে বোঝাতে হলে আমাদের ভাষাতেই বোঝাতে হবে। ঠাকুর বলছেন – কাকেই বা বলব কেই বা বুঝবে। ভাষাটা মাধ্যম কিন্তু ভাষা যদি সীমিত হয় তখন নতুন ভাষার সৃষ্টি করতে হবে। যেমন গণিত শাস্ত্রে, সাহিত্যের ভাষা গণিতে চলে না বলে সেখানে নতুন ভাষা ব্যবহার করতে হয়। বিজ্ঞানও নিজের জন্য নতুন ভাষা বার করে। কিন্তু এখানে দিব্যলীলা এগুলো তো জনগণের, জনগণের জন্য হওয়াতে সাধারণ ভাষাকে ব্যবহার করা হয়েছে। তার ফলে আমরা এগুলোকে মানবীয় দৃষ্টিতে দেখে থাকি। যার জন্য অনেক গোলমাল হয়ে যায়। প্রকৃতি আর চিন্ময় এই দুটি জগৎ, প্রকৃতিটাও তাঁরই। কিন্তু এখানে প্রকৃতি আর চৈতন্যের জগৎ আমাদের কাছে স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়ে আছে। আমরা হলাম জড় সাম্রাজ্যের বাসিন্দা, আমাদের মস্তিষ্কের সব কিছুই জড় পদার্থ দ্বারা নির্মিত। ফলে মস্তিষ্ক যখন চৈতন্য রাজ্যের কিছুকে ধরে তখন সেটাকে সে তার জড় রাজ্যের মত করেই দেখে। সেইজন্য বলা হয় এই রাসলীলার রস আর তার ঠিক ঠিক যে প্রভাব এটাকে বোঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভগবানকে উপনিষদে বলা হচ্ছে রসো বৈ সঃ, তিনি রসস্বরূপ। শাস্ত্র না জানা থাকলে কি রকম গোলমাল হয় তার খুব সুন্দর বর্ণনা কথামৃতে ঠাকুর ব্যঙ্গ করে বলছেন। অনেকে ঠাকুরকে বলত আপনি তো কিছু পড়াশোনা করেননি, তখন ঠাকুর বলতেন 'আমি শুনেছি কত'। সেইজন্য কথামৃত পড়ার সময় আমরা অবাক হয়ে যাই, যিনি কোন শাস্ত্র গ্রন্থ পড়েননি কিন্তু যেখানে শাস্ত্রীয় মূল কথাগুলো বলছেন সেখানে কোথাও একটুও কোন গোলমাল নেই। ব্রাহ্ম সমাজের একজন বক্তা উপাসনার সময় তাঁর বক্তৃতায় বলছেন ভগবান হলেন নিরস, আমাদের ভক্তি রস দিয়ে তাঁকে রসে পূর্ণ করতে হবে। আসলে ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা ঈশ্বরকে নিরাকার বলত, সেখান থেকে যিনি নিরাকার তিনি নিরস এই ভাবটা বক্তার মাথায় কোন ভাবে এসে গিয়েছিল। ঠাকুর দুঃখেই হোক আর ব্যঙ্গ করেই হোক বলছেন 'বেদে যাঁকে রসস্বরূপ বলা হয়েছে তাঁকে বলছে কিনা নিরস'। সেইজন্য আধ্যাত্মিক জীবনে যিনিই এগোতে চাইছেন প্রথমে তাঁকে শাস্ত্রটা বুঝতে হবে। শাস্ত্র না জানা থাকলে আধ্যাত্মিক জীবনে অনেক গোলমাল হয়ে যাবে। শাস্ত্রের কথা না জেনে ধ্যান ধারণা করতে গিয়ে মাথায় কোন চিন্তা উঠলে মনে হবে এটাই যেন ঠিক। আমাদের তাই বারবার করে বলা হয় আধ্যাত্মিক সত্যের মাপকাঠি হল শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। এই তিনটে এক না হলে কখনই আমার চিন্তা বা অনুভূতিকে সত্য বলে মনে করা হবে না। প্রথমে তাকে শ্রুতির সাথে মিল থাকতে হবে। যদি শ্রুতির সাথে সরাসরি মিল না থাকে, যেখানে মনে হচ্ছে আমি নতুন চিন্তা ভাবনা পেয়েছি, তখন দেখতে হবে আগে যেখানে শ্রুতিতে বলা হয়েছে সেটাকে কোথাও খণ্ডন করা হচ্ছে কিনা। যেমন ঈশ্বরকে

কোথাও নিরস বলা হচ্ছে না। আমি এখন বললাম ঈশ্বর নিরস। তাহলে আগে দেখ শ্রুতিতে ঈশ্বরকে রসের ব্যাপারে কি বলছে। শ্রুতিতে বলছে ঈশ্বর রসস্বরূপ। তাহলে আমার কথা নেওয়া যাবে না। এই ব্যাপারে আগেই শ্রুতিতে বলে দেওয়া হয়েছে। আমি যেটা বলছি সেটা শ্রুতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এছাড়াও দেখতে হবে যুক্তিতে দাঁড়াচ্ছে কিনা বা আমি যা অনুভূতি পেয়েছি সেটা অপরেও পেতে পারবে কিনা।

তিনি হলেন রসস্বরূপ। যত রকমের রস আছে সব রকমের রসকে যখন এক জায়গায় ঢেলে দেওয়া হচ্ছে আমাদের সাধারণ লৌকিক দৃষ্টিতে সেটাকেই বলা হচ্ছে রাস। রাস হল আনন্দের পরাকাষ্টা। ঠাকুর বলছেন নারী সঙ্গে আনন্দ কতটুকু, ব্রহ্মানন্দের আনন্দ তার থেকে শত কোটি গুণ বেশী। এই আনন্দকে মানুষকে বোঝান যাবে না। কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করার যে আনন্দ, ঈশ্বরের সাথে রমণ করার যে আনন্দ সেই আনন্দটা কি রকম তারই বর্ণনা এই রাসলীলাতে করা হয়েছে। সেইজন্য বলা হয়, এটা এত উচ্চ অবস্থার বর্ণনা যেটা সাধারণ লোক বুঝতেই পারবে না। তাই সাধারণ লোকের সামনে রাসলীলার বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়।

যারা জড় রাজ্যে বাস করেন এখানে তাঁদের কথা প্রথমে বলা হচ্ছে, জড় রাজ্যে বাস করা মানে বুদ্ধি বৃত্তিকে নিয়ে যারা চলে। যদিও বেশীর ভাগ লোক ইন্দ্রিয় রাজ্যেই বাস করে। বুদ্ধি বৃত্তি বলে এদের কিছু নেই, বুদ্ধির এলাকাতেও থাকে না। যারা বড় চিন্তাবিদ তারা বুদ্ধির এলাকায় থাকে। বাকি সব ইন্দ্রিয় রাজ্যেই বাস করে, ইন্দ্রিয় রাজ্য মানে আহার নিদ্রা আর মৈথুন, এই তিনটে ছাড়া আর কিছুর চাহিদা নেই। যারা জড় রাজ্যের বাসিন্দা, তাদের যত রকমের কামনা-বাসনা, মনের মধ্যে যে চিন্তা বা কল্পনা আছে, সেটা দিয়েই তারা জগৎকে দেখে। মন হল রঙিন কাঁচের মত। মন যে রঙে থাকবে সেই রঙেই সে জগৎকে দেখবে। যখন সে ঈশ্বরের কথা শোনে বা কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক মানুষের আচরণকে দেখে তখনও সেই ওই ভাবেই দেখে। ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায়কে বলছেন মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। তার মানে, তোমার মনে যে ধরণের বৃত্তি ও সংস্কার আছে, তুমি যখন যা কিছু দেখবে বা বিচার করবে তখন সেই বৃত্তি ও সংস্কার অনুযায়ীই করবে বা দেখবে। যে আহার, নিদ্রা আর মৈথুন নিয়েই আছে তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় জীবনের উদ্দেশ্য কি, তখন সে বঙ্কিম বাবুর মতই বলবে জীবনের উদ্দেশ্য আহার নিদ্রা আর মৈথুন। কিন্তু যারা আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করে যায় প্রথমেই তাদের এই তিনটে জিনিষ খসে যায়।

স্থূল, সূক্ষ্ম আর কারণ এই তিন রকম দেহের সংযোগে আমাদের এই প্রাকৃত শরীর নির্মিত। এই তিনটের মধ্যে স্থূল শরীরের কোন মূল্যই নেই। সুস্থ শরীর, অসুস্থ শরীর, সুন্দর শরীর, কুৎসিৎ শরীর আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এগুলোর কোন তাৎপর্যই নেই। সূক্ষ্ম শরীরের কিন্তু বিরাট গুরুত্ব আছে। সুক্ষ্ম শরীর দিয়েই সব কিছু চলছে। সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে থাকে কারণ শরীর, যে শরীর দিয়ে সব কিছু নির্মাণ করা হচ্ছে। সূক্ষ্ম শরীরের থেকে কারণ শরীরের গুরুত্ব অনেক বেশী। যতক্ষণ কারণ শরীরটা থাকবে ততক্ষণ মুক্তি হবে না। স্থূল শরীর থেকে যখন ইচ্ছে আমরা মুক্তি পেতে পারি, আত্মহত্যা করে দিলেই এই স্থূল শরীর থেকে মুক্তি হয়ে যাবে। যে আত্মহত্যা করছে সে মনে করছে আমার মুক্তি হয়ে গেল। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরটা তো থেকে গেছে। আত্মহত্যা করার জন্য এই সূক্ষ্ম শরীরটা প্রেতযোনীতে গিয়ে পড়ে থাকবে। কোন রকমে যদি সূক্ষ্ম শরীর থেকে মুক্তি হয়ে যায়, তখনও কিন্তু তার মুক্তি হবে না। কারণ তার কারণ শরীরটা থেকে গেছে। সূক্ষ্ম শরীর থেকে মুক্তি হয়ে গেলে যে কারণ শরীর থেকে যাচ্ছে, এই শরীর সাধারণ জগতে থাকে না, খুব উচ্চ জগতে চলে যায়। যেখানে প্রকৃতির রাজ্যে যে কোন শরীরের জন্ম হচ্ছে তখন দুটো জিনিষের মিলন হতে হয়। সচরাচর বলা হয় নারী-পুরুষ সংযোগেই শরীরের জন্ম হয়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে ঋষি মুনিরা নারী-পুরুষের সংযোগ ছাড়াও জন্ম দেওয়ার জন্য বা সৃষ্টির ব্যাপারে আরও কতকগুলো পদ্ধতির কথা বলে গেছেন। যেমন বলে থাকেন যাঁরা উচ্চ কোটির ঋষি তাঁরা সঙ্কল্প মাত্রই যে কোন কিছুর সৃষ্টি করে দিতে পারেন। এখানে কিন্তু ব্রহ্মা বা প্রজাপতির কথা বলা হচ্ছে না। মহাভারতেও উল্লেখ আছে যে, যাঁর লোকসিদ্ধি হয়ে গেছে অর্থাৎ যিনি পৃথিবী তত্ত্বকে জয় করে নিয়েছেন, তিনি ইচ্ছে করলেই যে কোন জিনিষকে সৃষ্টি করে দিতে পারেন। শাস্ত্রে কিছু ব্যাখ্যা আছে, যেটাকে এনারা সবাই মানেন, সেখানে বলা হচ্ছে মহাপুরুষ যদি হৃদয়, কর্ণ, নেত্র, মস্তক ইত্যাদি যে কোন অংশে শুধু মাত্র স্পর্শ করে দেন সেখান থেকেই একটা শরীরের জন্ম হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও একটা সংযোগের ব্যাপার আছে, একটা নারী শরীর আছে আর একজন মহাপুরুষ আছেন। যদিও স্বাভাবিক কামজনিত কারণে যেভাবে শরীর হয় এখানে সেভাবে হচ্ছে না কিন্তু অন্য প্রক্রিয়ায় হয়। আবার কখন সখন এমনও হয় এই সংযোগেরও দরকার হয় না। এটাই হয়ে যায় অমৈথুনী শরীর। অমৈথুনী শরীর মানে যে শরীরের জন্মের জন্য দুটো শরীরের সংযোগের দরকার হচ্ছে না। একা একাই সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, যেমন ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা একাই সঙ্কল্প করলেন সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়ে গেল। আরেক ধরণের সৃষ্টির প্রক্রিয়া আছে যেটাকে বলা হয় নির্মাণকায়। নির্মাণকায়ের মত আরেক

ধরণের প্রক্রিয়াকে বলা হয় ব্যুহকায়। ব্যুহকায় যেন নির্মাণকায়ের ভাই। যোগীরা যখন সাধনা করেন তখন তাঁরা যোগদৃষ্টিতে দেখতে পান যে, তাঁর অনেকগুলো কর্ম বাকি আছে। এই কর্মগুলোকে কাটাতে তাঁর হয়ত দশটা জন্ম লেগে যাবে। তখন তাঁরা যোগশক্তিতে এক সঙ্গে নিজেরই দশটা শরীর তৈরী করে নেন। এবার ঐ দশটা শরীর দিয়ে দশ রকমের দশটা জন্মের কর্ম পার করতে শুরু করে দেন। তাতে এই এক জন্মেই তাঁর কর্মগুলো ক্ষয় হয়ে যায়। যদিও এই শরীরগুলো অত্যন্ত শুদ্ধ হয়, কারণ যোগী নির্মাণকায়ে তাঁর নিজের যোগশক্তিতে এই শরীরকে দাঁড় করিয়েছেন, সেখানে কোন ধরণের মৈথুন, কোন ধরণের স্পর্শ কিছুই নেই। এই শরীরগুলো করা হয়েছে কিসের জন্য? যোগ ধ্যান, তপস্যা করতে হবে তার জন্য দশটা শরীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এই নির্মাণকায় বা ব্যুহকায় যাই হোক এই শরীরগুলো তৈরী করা হয়েছে প্রকৃতির এলাকাতেই। কারণ প্রকৃতির উপাদান নিয়েই এই শরীরগুলো নির্মিত হয়। এমন কি দেবতাদের যে দিব্য শরীর সেটাও এই প্রকৃতির। দেবতাদের শরীরে তেজ তত্ত্ব বেশী থাকে এবং এই তেজ তত্ত্ব প্রকৃতিরই একটা উপাদান। এর বাইরে যে শরীর তৈরী হয় সেটাকে বলা হয় অপ্রাকৃত শরীর, যেটা প্রকৃতির বাইরে। অপ্রাকৃত শরীর সব সময় চিদানন্দময়, কারণ এই শরীর প্রকৃতির রাজ্যে তৈরী হয় না। এখানে ব্যাসদেব বলছেন শ্রীকৃষ্ণের শরীর অপ্রাকৃত শরীর, শুধু আনন্দ দিয়ে এই চিদানন্দময় শরীর তৈরী। চিদানন্দময় শরীরের দেহ দেহী, আমি ও আমার এই শরীর আর আমি এই শরীরে বাস করছি এই ভাবটা কখন আসে না। কারণ এটা অপ্রাকৃত শরীর। ঠিক তেমনি গুণ-গুণী, রূপ-রূপী, নাম-নামী, লীলা আর লীলা পুরুষোত্তমের কোন তফাৎ থাকে না।

এখানে খুব সুন্দর একটি কথা বলা হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের একেকটি অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ রূপ। এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। শ্রীকৃষ্ণের যে মুখাবয়ব সেটি যেমন পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তেমনি তাঁর শ্রীপদের নখ সেটিও শ্রীকৃষ্ণ। ফলে তাঁর প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের এই ধরণের ছবি যদি সহজে বুঝতে হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণের একটা কোলাজ্ তৈরী করা। কোলাজটাও শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু, বিন্দু বিন্দু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে কোলাজ্ তৈরী করা হয়েছে, সেই বিন্দুগুলিও শ্রীকৃষ্ণ। যখন নাকটাকে ম্যাগনিফাই করছি তখন দেখছি নাকটাও শ্রীকৃষ্ণ, এরপর নাকের ছোট্ট একটা অংশকে বড় করলাম তখন দেখছি সেটাও শ্রীকৃষ্ণ। এইভাবে প্রত্যেকটি অনু শ্রীকৃষ্ণ। এই ভাবটা আসলে আর কিছুই নয়, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তাঁর শরীর প্রাকৃত নয়। প্রাকৃতিক শরীরে যে কান, নাক, চোখ আছে এগুলো সবই প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী কাজ করবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শরীর সেই রকম প্রাকৃত শরীর নয়। ফলে তিনি তাঁর কান দিয়ে চোখের কাজও করতে পারবেন আবার চোখ দিয়ে কানের কাজও করতে পারবেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির সব নিয়মের বাইরে। এর ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শরীর পূর্ণতম। শ্রীকৃষ্ণের এই অঙ্গটা শ্রেষ্ঠ আর এই অঙ্গটা নিম্ন এই নিয়ম চলবে না। পুরুষসূক্তমে বলা হচ্ছে পুরুষের পা থেকে শূদ্রের জন্ম। এই নিয়ে অনেক বিতর্কমূলক কথাবার্তা হয়। ভগবানের পা কি কোন নিকৃষ্ট বস্তু? এখানে বলছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেকটি অঙ্গই শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের মুখের যে মূল্য তাঁর পায়ের সেই একই মূল্য। দ্বিতীয় কথা, ভগবানের যখন বন্দনা করা হয় তখন তাঁর শ্রীচরণের বন্দনাই করা হয়।

সেইজন্য বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুরী নিত্য শোভনশীল। এই রূপের কোন ক্ষয় হয় না। দিনে দিনে যেন রূপটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আসলে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে বলা হচ্ছে তাতে এটাই সিদ্ধ করতে চাইছেন, এর অর্থ হল এই রূপের কখন হ্রাস প্রাপ্তি হয় না। একই রূপ আর সৌন্দর্য দেখে দেখে মানুষের মনে একঘেঁয়েমি আসতে পারে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপের নিত্য নবীন সৌন্দর্যময়তায় মানুষের বিরক্তি ভাব আসে না। এর ফলস্বরূপ তাঁর সৌন্দর্য সমস্ত প্রাণীকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করে মোহিত করে তাঁর দিকে টানতে থাকে। ঈশ্বরীয় রূপের এইটাই বৈশিষ্ট্য, মানুষকে অতি সহজে টেনে নেয়। সেইজন্য বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণনা করা হয় শ্রীরামচন্দ্র যখন সভায় প্রবেশ করলেন তখন যেন হাজারটা সূর্য জ্বলে উঠল। সে আলোতে বাকি সবাইর তেজ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। শ্রীরামচন্দ্র আবার যখন সভা ত্যাগ করে চলে যান তখন জায়গাটা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চৈতন্য সত্তার প্রকাশ যাঁর মধ্যে যত বেশী বিকশিত, তাঁর সৌন্দর্য তত বেশী মানুষকে আকর্ষণ করে আর তাঁর ব্যক্তিত্বের তেজ সেই জায়গার পরিবেশকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে তুলে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণ করতেন, বনের মধ্যে বিচরণ করতেন তখন বন্য পশু, বৃক্ষ, লতা, নদী, পাহাড়ও তাঁর সৌন্দর্যে পুলকিত হয়ে উঠত।

শ্রীকৃষ্ণের এটা একটা দিক। অন্য দিকে গোপীদের ব্যাপার যখন আসে তখন তাঁদের সাধনার কথা আসে। সাধনা দুই রকমের। একটা সাধনা হল বৈধী ভক্তি। বৈধী ভক্তি বলতে বলা হয় বিধি-বাদীয় ভক্তি, অর্থাৎ ধর্মীয় নীতি ও বিধি অনুসারে পূজো, পাঠ, জপ-ধ্যান ইত্যাদি। সূর্যোদয়ের আগে উঠতে হবে, জপ-ধ্যান করতে হবে, পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে হবে, তীর্থ করতে হবে এগুলো সবই বৈধী ভক্তি। তীর্থ করা মানে কাজিরাঙা ফরেস্ট, দার্জিলিং, কালিম্পং বেড়াতে যাওয়া নয়। যারা দৈবী শক্তি সম্পন্ন তারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে কখনই যাবে না। যাদেরই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে এখনও ভালো

লাগছে, চাঁদ দেখতে ভালো লাগছে, নদীর ঢেউ গুনতে ভালো লাগছে, মনের মধ্যে যেখানেই প্রকৃতিকে নিয়ে কোন কিছু চলছে বুঝতে হবে তার মধ্যে এখনও আধ্যাত্মিক সত্তা নিষ্প্রভ হয়ে আছে। কথামৃত, স্বামীজীর রচনাবলী, পুরো বেদ উপনিষদে কোথাও প্রকৃতিকে নিয়ে একটি শব্দ নেই, কোথাও চাঁদের বর্ণনা, নদীর বর্ণনা পাওয়া যাবে না। যারা এগুলোর বর্ণনা করতে ভালোবাসে, দেখতে ভালোবাসে তারা এখনও আসুরিক শক্তিতে পরিপূর্ণ। কালিদাসের কবিত্বের প্রতিভা ব্যাসদেব থেকেও অনেক উচ্চমানের কিন্তু ব্যাসদেবের চরণে সারা ভারত গুরু বলে মাথা নত করছে। বাল্মিকীর কবি প্রতিভার সাথে কালিদাসের কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে, কিন্তু সেখানেও বাল্মীকিকে ভারতবাসী যেভাবে মনে রেখেছে সেইভাবে কালিদাস অতটা ভারতবাসীর হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পারেনি। কালিদাস ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। মনে মনে আমরা সবাই সৌন্দর্যের পূজারী। এখানে সৌন্দর্যের পূজারী মানেই প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতির পূজারী মানে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশের অনেক দেরী আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে যারা উপভোগ করতে চাইছে তাদের তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, এদের এখনও অনেক সময় লাগবে। তাড়াহুরোর করারও দরকার নেই, কারণ প্রকৃতি তো অনিত্য আর ঈশ্বর নিত্য। যেটা অনিত্য সেটাকেই আগে ধরতে হবে, নিত্য তো আর কোথাও যাবে না, সেতো থাকবেই। এই জন্মে না হলে পরের জন্মে হবে, পরের জন্মে না হলে তার পরের জন্মে হবে। যারা বৈধী ভক্তি করতে চাইছে তাদের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ভোগ করাও বন্ধ করে দিতে হবে। এটাকে বন্ধ করে তাদের হয় ঘরে বসে জপ-ধ্যান করে যেতে হবে তা নাহলে তীর্থ দর্শনে যেতে হবে। তবে এগুলো সবই বৈধী ভক্তি।

বৈধী ভক্তি করতে করতে একটা অবস্থা আসে যখন এই বৈধী ভক্তিকেও অতিক্রম করে ওপারে চলে যায়। এটাকে বলা হয় প্রেমাভক্তি। এর অনেক রকম পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। ঠাকুরও এই প্রেমাভক্তিকে কখন বলছেন রাগাত্মিকা ভক্তি। অনেক সময় এই প্রেমাভক্তিকে মর্যাদারহিত বলা হয়। মর্যাদরহিত মানে মর্যাদাকে ভঙ্গ করে দেয়। মর্যাদাকে যখন অতিক্রম করে যায় তখন তাকে অনেক সময় অবৈধ ভক্তি বলে। অবৈধ মানে বিধিকে আর মানছে না। আমরা যখনই গোপী, কৃষ্ণ আর রাসলীলার কথা স্মরণ করি তখন আমরা ভুলে যাই যে, গোপীরা যা কিছু করেছিলেন তার তুলনায় ঠাকুর অনেক গুণ বেশী বিধিকে উল্লঙ্ঘন করেছেন। মা ভবতারিণীর পূজো করছেন, ঠাকুর দেখছেন চারিদিকে চিন্ময়ী মা বিরাজমানা, চারিদিকে ফুল ছুঁড়ছেন। এটাই অবৈধ ভক্তি হয়ে গেল, বিধি আর পালিত হচ্ছে না। বিধি কি করতে বলছে? বিগ্রহের চরণে ফুল দিতে হবে। আমরা যদি ঠাকুরের মত করতে যাই আমাদের পাগলা গারদে পুরে দেবে। ঠাকুরকেও পাগল বলে প্রচার করার চেষ্টা হয়েছিল। আর এই পাগলের চিকিৎসার জন্যই তাঁকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এই বৈধী ভক্তি যখন সাধককে তুঙ্গে নিয়ে চলে যায় তখন একটা অবস্থার পর যিনি আধ্যাত্মিক সত্তা তিনি নিজে সাধকের সব ভার নিয়ে নেন। তখন আমি তুমি ভেদটা মুছে যায়। অবৈধ ভক্তি বা প্রেমাভক্তি বা রাগাত্মিকা ভক্তি যখন হয় তখন আমি তুমির স্থান, কালের ভেদাভেদটা মুছে গিয়ে আমি তুমিটা এক হয়ে যায়। তখন যা কিছু হয় সবটাই বিধি নিষেধকে পার করে যায়। বিধি নিষেধ পার করে যাওয়ার পর কি রকম জিনিষটা দাঁড়ায় এটা ঠাকুরের মায়ের প্রথম দর্শনের পর তিনি মন্দিরে যে ভাবে পূজাদি করছেন তাতে আরও পরিষ্কার বোঝা যায়। মাকে ভোগ নিবেদন করেছেন, দেখছেন বেড়াল। ঠাকুর দেখছেন মা ঐ বেড়াল রূপেই এসেছেন, বেড়ালকেই ভোগ খাইয়ে দিচ্ছেন। এটা যে কত উচ্চ অবস্থায় হতে পারে এ আমাদের কল্পনার বাইরে। এই ঘটনাকে যদি আমরা নিয়মানুসারে বিচার করি তাহলে গোপীদের রাসলীলা আর ঠাকুর যে বেড়ালকে মা কালীকে নিবেদন করার আগে ভোগ খাইয়ে দিচ্ছেন এই দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দুটোতেই বিধিকে লঙ্ঘন করে দেওয়া হচ্ছে।

বিধি নিষেধের সাথে সাথে আমাদের অনেক কর্ম ও ধর্ম পালন করতে হবে। বলা হয় এগুলো না করাটা অত্যন্ত পাপ। কিন্তু যখন ভক্তির উদ্দাম তরঙ্গের ঢেউ আছড়ে পরে তখন এই সব কর্ম, ধর্ম ছিটকে বেরিয়ে যায় আর প্রেমটা অবৈধ অবস্থায় চলে যায়। প্রেম অবৈধ হয়ে গেলে যে জিনিষগুলো করার জন্য আগে প্রশংসা করা হত, সেগুলো করাটাই তখন পাপ বলা হয়। যার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা জেগে গেছে, যার মন প্রাণ ঈশ্বরের প্রেমে ডুবে গেছে, সে যদি তখন কোন বিধি নিষেধ পালন করে সেটাই তার কাছে কলঙ্ক। আগে বিধি নিষেধ পালন না করাটা ছিল কলঙ্ক, ঈশ্বরের প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করার পর এই বিধি নিষিধটাই হয়ে যায় বন্ধন। তখন তিনি আর কিছুই পালন করেন না, তিনি যে আগে থাকতে ঠিক করে নিয়ে পালন করছেন না, তা নয়। এগুলো আপনা থেকেই খসে যায়। গীতায় ভগবান বলছেন সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য, সর্বধর্মান্ মানে যত রকমের বিধি নিষিধ আছে সব কিছুকে পার করে যেতে হবে। যদি বলে আমাকে বিধি নিষেধ পার করত হবে, তখন এটাও একটা ধর্মের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে চিন্তা করে পার করতে হচ্ছে না, তাঁর মস্তিষ্কই এমন ঈশ্বর প্রেমে আবিষ্ট হয়ে গেছে, এমন একাগ্র বোধ হয়ে গেছে যে কোন হুঁশ নেই।

রাসলীলাতে গোপীরা যে শ্রীকৃষ্ণের কাছে অভিসারে এসেছেন, এখানে ঠিক এই অবৈধ ভক্তিরই প্রকাশ হয়েছে। যত রকমের বন্ধন হতে পারে, যত রকমের বিধি নিষেধ হতে পারে সব কিছুকে পার করে অভিসারে চলে এসেছেন। গীতায় অর্জুনকে যে *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজের* কথা বলা হয়েছে ঠিক এই জিনিষটাই রাসলীলাতে গোপীরা করেছেন। রাসলীলাতে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা শুধু এই বোধ করার জন্য যে, প্রেমাভক্তিতে কি হতে পারে। এই প্রেমাভক্তিকে কোন ভাবে জাগতিক স্তরে অনুকরণ করা একেবারে নিষিদ্ধ। অবৈধ ভক্তি একমাত্র ভগবানই করতে পারেন, ভগবান ছাড়া আর কারুর পক্ষে অবৈধ ভক্তি করা সম্ভবই নয়। যিনি এই অবৈধ ভক্তিতে যেতে চাইছেন তাঁকে ঐ স্তরে যেতে হবে, ঈশ্বরের ভালোবাসার জন্য আমাকে সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে। তাঁর প্রতি এমনই ভালোবাসা আসবে যে জাগতিক সমস্ত কিছু খড়কূটোর মত উড়ে যাবে, এই না হলে অবৈধ ভক্তি হয় না।

রাসলীলা আলোচনা শুরু করার আগে এই কয়েকটি মূল জিনিষকে আমাদের খুব ভালো করে বোঝা দরকার। প্রথম হল, তিনি হলেন রসস্বরূপ। যখন নানান রকমের রস এই জায়গাতে সম্মিলিত হচ্ছে সেটাই হল রাস। দ্বিতীয় হল, ভগবানের শরীর নিত্য চিদানন্দময়। তাঁর শরীর ধারণটাই মায়া। *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং*, আমার জন্ম, আমার কর্ম সবটাই দিব্য। এই দিব্য ভাবকে না বুঝতে পারলে প্রকৃতির এলাকাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। আমাকে পাওয়ার শেষ কথা *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য*, যত রকমের বিধি নিষেধ আছে সব কিছুকে লঙ্ঘন করে বেরিয়ে এস। গোপীরা দেখাচ্ছেন কি ভাবে সব বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করে ঈশ্বরের জন্য বেরিয়ে আসতে হয়। এই বিধি নিষেধকে লঙ্ঘন করা সন্ন্যাস আদর্শের মধ্যে একটা। কিন্তু সন্ন্যাসীর আদর্শ হল সর্বধর্ম যখন পরিত্যাগ করা হয়। এই পরিত্যাগটা আনুষ্ঠানিক ভাবে করা হয় যদিও স্বাভাবিক ভাবে পরিত্যাগ করা হয় না। সর্বধর্ম স্বাভাবিক ভাবে পরিত্যাগ করা হয় যখন মানুষ খুব উচ্চ স্তরে চলে যায়। সন্ন্যাস বলতেই বোঝায় সব রকমের বিধি নিষেধকে ত্যাগ করে দেওয়া। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বুদ্ধিভেদ না হয় সেইজন্য সন্ন্যাসীরা কিছু কিছু আচরণ পালন করেন। সন্ন্যাসী লোকশিক্ষার জন্য কোন নিষিদ্ধ কর্ম করে না। ঠাকুর বলছেন যে নাচতে পারে তার কখন বেতালা পা পড়ে না। ঐ উচ্চ অবস্থায় তাঁর এমন অবস্থা হয় যে তাঁর শরীর বোধই থাকে না, যার শরীর বোধ চলে যার তাঁর কাছে বিধিই কি আর নিষেধই বা কি।

ভাগবতের দশম স্কন্দের এই পাঁচটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীদের নানান রকম রসের বর্ণনা আছে। শরৎ কালে এই রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বলছেন *ভগবানপি ত রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্য রন্তুঃ মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।।*১০/২৯/১। চীরহরণের সময় ভগবান গোপীদের বলেছিলেন তোমাদের সবার সঙ্গে একদিন আমি রাস করব। ভগবান সঙ্কল্প করলেন তিনি তাঁর যোগমায়ার সাহায্যে রসময়ী রাসলীলা করবেন। এইখানে এসে সেই সময়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হচ্ছে। রাসলীলার উচ্চ ভাবকে ধারণা করার জন্য এখানে জাগতিক ভাবকে অবলম্বন করা হয়েছে। *দৃষ্ট্বা কুমুদ্বনত্মখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুমকুমারুণম্। বনং চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্।।*১০/২৯/৩। শরতের চাঁদের কোমল স্নিগ্ধ সৌন্দর্যেকে তুলনা করে বোঝানোর জন্য বলছেন বিকশিত চন্দ্রমা যেন লক্ষ্মীদেবীর অপরূপ সুন্দর মুখ। সচরাচর কারুর মুখের সৌন্দর্যকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয় তার মুখ চাঁদের মত। কিন্তু এখানে উল্টো, চাঁদকে লক্ষ্মীর মুখের সঙ্গে তুলনা করে বলা হচ্ছে চাঁদের মুখ কত সুন্দর, লক্ষ্মীদেবীর মুখের মত। শরৎ ঋতুতে চাঁদের উদ্ভাসিত আলোর বর্ণনা করার পর বলছেন সেই চাঁদের কোমল কিরণে যখন প্রকৃতি প্লাবিত হয়ে গেছে সেই সময় সমগ্র পরিবেশটি নিজ দিব্য রসের বিস্তারের অনুকূল বুঝে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশিতে ব্রজসুন্দরীদের মনোহারী মধুর ধ্বণি তুলে বাজাতে শুরু করেছেন। এখানে ব্যাখ্যাকাররা বলছেন এই যে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশিতে মধুর সুর বাজাচ্ছেন এতে ক্লীং ধ্বণি অনুরণিত হচ্ছে। ক্লীং যেমন শক্তির বীজমন্ত্র, ঠিক তেমনি ক্লীং শ্রীকৃষ্ণেরও বীজমন্ত্র। ক্লীং বীজমন্ত্র আবার পূর্ণ প্রেম শক্তির অভিব্যক্তি, ক্লীং বীজমন্ত্রে পূর্ণ প্রেমের শক্তি জাগ্রত হয়। কেউ যদি কাউকে মাথায় রেখে অনেক দিন ক্লীং মন্ত্র জপ করে তখন সেই ব্যক্তির মধ্যে তার প্রতি একটা আকর্ষণ এসে যাবে। কারণ ক্লীং আবার আকর্ষণেরও মন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি থেকে ক্লীং বীজমন্ত্রের ধ্বণি উদ্‌গাত হয়ে অনুরণিত হয়ে সেই তরঙ্গ গোপীদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করার পর গোপীদের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যদিও গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা ছিল কিন্তু বংশীধ্বণি গোপীদের কানে এসে প্রবেশ করার পর গোপীদের মনের যত রকমের বৃত্তি ছিল, যে বৃত্তি গুলি প্রেমাভক্তির ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ যেমন ভয়, সঙ্কোচ, ধৈর্য, মর্যাদা ইত্যাদি, এই বৃত্তি গুলির নাশ হয়ে গেল। এই বৃত্তিগুলি মানুষকে জাগতিক জীবনে বন্ধনে ফেলে রাখে। সাংসারিক জীবন চালাতে এই বৃত্তিগুলির প্রয়োজন আছে, যেমন মেয়েদের যদি ভয়ডর না থাকে তাহলে সংসারে অনেক গোলমাল হয়ে যেতে পারে, তেমনি সঙ্কোচ, লজ্জা এগুলো নারীর আভূষণ। এই আভূষণ গুলিই বন্ধন কারক, তা নাহলে সাংসারিক জীবনে ভেসে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বণি দিয়ে এই বৃত্তিগুলিকে নাশ করে দিয়েছেন। এখন গোপীদের যত রকমের বন্ধন ছিল

সব খুলে গেছে। সব বন্ধন খুলে যেতেই ব্রজের সমস্ত গোপীরা নিজ নিজ গৃহ থেকে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে বেরিয়ে পড়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের এমনই ভালোবাসা যে একে অপরেকে যে বলবে চল যাই, সেটাও কাউকে বলতে চাইছে ন। সবাই চাইছে আমি যেন একাই শ্রীকৃষ্ণকে কাছে পাই। শ্রীকৃষ্ণকে একা পাওয়ার জন্য এক গোপী আরেক গোপীর থেকে আড়ালে লুকিয়ে অভিসারে চলেছে। এক গোপীর সাথে অন্য গোপীর যদি দেখা হয় একজন জিজ্ঞেস করবে 'তুমি কোথায় চলেছে'? অন্য গোপী বলত 'এই আমি একটু বাজারের দিকে যাচ্ছি'। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ'? 'এই আমি একটু নদীর ধারে যাচ্ছি'। তারপর দেখা যাবে দুজনে এক জায়গাতে গিয়েই পৌঁছেছে। এই জায়গাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু যে বাড়ির লোকদের গোপন করেছে তা নয়, যারা সখী যারা নিজদের সব সুখ-দুঃখের অংশীদার কিন্তু এই জায়গাতে তারা অংশীদারী করবে না, আমার নিজের জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে চাই। এখানে গোপীরা এক অপরের থেকে লুকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

খুব সুন্দর বর্ণনা করা হচ্ছে। সন্ধ্যে বেলা বেশ কয়েকজন গোপী গরুর দুগ্ধ দোহন করছিল। আগেকার দিনে মেয়েরাই গরুর দুধ দোহন করত, সেই থেকে মেয়েদের বলা হত দুহিতা। দুহিতা থেকে কন্যাকে দুহিতা বলা হয়। এখানে বলছেন যে গোপী দুধ দুইছিল সে দুধ দোহন বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ল। কেউ আবার দুধ গরম করছিল, সে তাড়াতাড়ি করে দুধ গরম না হতেই নামিয়ে রেখে চলে গেল। যে রান্না করছিল, রান্না যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। গোপীরা যে সবাই কুমারী তা নয়, বেশীর ভাগই বিবাহিতা। নিজের শিশুকে স্তন্য পান করাচ্ছিল, সেই অবস্থাতে শিশুকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির এমনই টান যে যার কানে সেই ধ্বণি পৌঁছেছে সে যে অবস্থাতে আছে সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে এসেছে। কেউ নিজেদের স্বামীর সেবা করছিল, কেউ অঙ্গরাগ দিয়ে প্রসাধন করছি। যে যা কাজ করছিল সেই কাজ ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়ল। ইংরাজীতে পাইপ পাইপার অফ হ্যামিল্টন নামে একটা খুব বিখ্যাত কবিতা আছে। একটা শহরে ইঁদুরের খুব উৎপাত হচ্ছিল। ইঁদুরকে কিছুতেই বশ করা যাচ্ছে না। তখন পাইপ পাইপার এসে বলল আমি সব ইঁদুরকে টেনে সরিয়ে দেব। সে বাঁশি বাজাতে শুরু করতেই ইঁদুর গুলো তার পেছনে পেছনে চলতে শুরু করেছে। সেও নদীতে নেমেছে ইঁদুর গুলোও নদীতে ডুবে মরে গেল। পাইপ পাইপার এসে এবার বলছে 'আমাকে মজুরি দাও'। সবাই বলছে 'এই একটু বাঁশি বাজালে তার জন্য এত পয়সা চাইছ'! পাইপার বলল 'ঠিক আছে তোমাদের কোন পয়সা দিতে হবে না'। এবার সে আবার বাঁশি বাজাতে শুরু করেছে, এবার বাঁশির আওয়াজে শহরের সব বাচ্চাগুলো তার পেছনে পেছনে বেরিয়ে চলে গেল। তারপর সব বাচ্চাকে একটা গুহার মধ্যে বন্দী করে রাখল। মা-বাবা নিজের বাচ্চাদের ধরার চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারল না।

শুকদেব ভাগবতে বলছেন এই গোপীদের মধ্যে একটু জার ভাব ছিল, মানে তাদের মধ্যে একটু হলেও কাম ভাব ছিল। কিন্তু ভালোবাসাটা ছিল সেখানে যেখানে আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের ভাবটাই ছিল আসল। এখন যে যে ভাব নিয়েই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে থাকুক কিন্তু তিনি তো পরমাত্মা, ফল সেই একই। ঠাকুর বলছেন মিছরির রুটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও মিষ্টিই লাগবে। শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করার ফলে গোপীদের যে গুণময় পার্থিব শরীর সেটা থেকে গেল আর তাদের অপ্রাকৃত শরীরটা সামনে চলে এল। অপ্রাকৃত শরীর গুণময় হয় না, সেইজন্য এই শরীর স্থূল, সুক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটে শরীরের বাইরে, এই শরীরটাই একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য শরীর। এখন শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীদের যে মিলন হচ্ছে এই মিলন আর পার্থিব শরীরে হচ্ছে না। পার্থিব শরীরটা পড়ে রয়েছে, কিন্তু আসল শরীরটা হল অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে একেবারে তন্ময় হয়ে যাওয়াতে গোপীদের কর্ম বন্ধন যেটা আত্মাকে শরীরের সাথে বেঁধে রাখে সেই বন্ধন এখন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

পরীক্ষিৎ তাঁর ঠাকুর্দার ইষ্টের নামে এই সব কথা শুনে আঁৎকে উঠেছেন – শ্রীকৃষ্ণ এগুলো কি করেছিলেন। সমাজে কোন পুরুষ যদি অপরের স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি দেয় তাতেই কত দুর্নাম হয়ে যায়, আর এখানে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের সব ললনাদের নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। পরীক্ষিৎ তাই শুকদেবকে প্রশ্ন করছেন *কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে। গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্।।*১০/২৯/১২। খুব তাত্ত্বিক প্রশ্ন করেছে পরীক্ষিৎ। হে মুনিবর! আপনি যে বলছেন গোপীরা অপ্রাকৃত শরীর লাভ করেছে, এটা কি করে সম্ভব। কারণ *কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং*, শ্রীকৃষ্ণ দেখতে এত রূপবান ছিলেন আর তাঁর প্রতি ব্রজললনাদের এত ভালোবাসা যে তারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখছে পরং কান্তং, পরম প্রিয়তম। তাদের সবার স্বামী থাকতে পারে, তাদের কারুর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে কিন্তু সবাই শ্রীকৃষ্ণকে দেখছে প্রিয়তম রূপে, ব্রহ্ম বলে তো তাঁরা ধারণা করেনি। তাই প্রিয়তম রূপে দেখে তাদের কি করে অপ্রাকৃত শরীর হবে? কারণ অপ্রাকৃত শরীরের জন্য দরকার ব্রহ্ম ভাব। আমরা যখন ঠাকুরকে ইষ্ট ভেবে সাধনা করছি তখন আমরা ঠাকুরকে কিভাবে দেখছি? যদি আমাদের মনে হয় ঠাকুর

কামারপুকুরে জন্ম নিলেন আর কাশীপুরে শরীর ত্যাগ করলেন তাহলে সেখানে আমাদের ব্রহ্ম ভাব নেই। আর যদি ব্রহ্ম ভাবও থাকে তাহলে তার জন্মই কোথায় আর মৃত্যুই বা কি। ঈশ্বরের আবার কিসের জন্ম আর কিসের মৃত্যু। আবির্ভাব বা তিরোভাব হতে পারে কিন্তু জন্ম-মৃত্যু তো হবে না। যদি ব্রহ্ম ভাব থাকে তখন বলবে যিনি নির্গুণ নিরাকার তিনিই সগুণ সাকার হয়েছেন। কিভাবে হয়েছেন? তাঁর নিজের যোগমায়াকে আলম্বন করে। আবার মজার ব্যাপার হল সেই মায়া তাঁতে আশ্রিত, তিনিই আবার তাকে আশ্রয় করছেন। যেমন মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সার ভেতর থেকেই জালটা বেরিয়েছে আবার সেই জালের উপরই মাকড়সা বিচরণ করছে। ঐ মাকড়সাই আবার জালটাকে টেনে খেয়ে নেবে। এগুলো সব উপমা, ভাবটাকে ধারণা করবার জন্য উপমা দেওয়া হয়। তিনি একটা মায়া সৃষ্টি করেছেন, সেই মায়ার মধ্যে তিনি নিজে প্রবেশ করে এই খেলা করছেন। এটাকেই যিনি ব্রহ্ম ভাবে গ্রহণ করেন তাঁরই ব্রহ্মজ্ঞান হবে তাছাড়া হবে না। আমি সারা জীবন ঠাকুরের চরণে মাথা ঠুকে যেতে পারি, সারা জীবন ধূপধুনো দিয়ে যেতে পারি কিন্তু ওতে কিছুই হবে না। তাহলে কখন হবে? যখন ঠাকুরের সব কিছুকে ব্রহ্মভাবে দেখা হবে। এর আগে আমি প্রকৃতিরই উপকরণ দিয়ে প্রকৃতিরই পূজো করে যাচ্ছি। ফুল, চন্দন এগুলো প্রকৃতিরই উপকরণ, যত প্রণাম মন্ত্র আমার স্মৃতিতে আছে সব প্রকৃতির এলাকা। এইভাবে পূজো করতে থাকলে প্রকৃতির মধ্যেই ঘুরতে থাকব। কখন ভালো স্বর্গে যাব কখন পৃথিবীতে ভালো পরিবারে জন্ম নেব, আবার মরে স্বর্গে যাব। এর বাইরে আর যাওয়া যাবে না। ব্রহ্ম ভাব না হলে এর বাইরে যাওয়া যাবে না।

পরীক্ষিৎএর মনেও এই প্রশ্ন আসছে। 'গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম করত, একটা মেয়ে ছেলেকে যেভাবে ভালোবেসে থাকে। তাদের তো ব্রহ্ম ভাব নেই, তাহলে অপ্রাকৃত শরীর, যেটা আপনি বলছেন গুণপ্রবাহ শরীর, যেমন আমাদের শরীর গুণপ্রবাহের শরীর, সত্ত্ব, রজো ও তমো দিয়ে শরীর তৈরী। আর আপনি বলছে অপ্রাকৃত শরীর, তাদের দিব্য শরীর বেরিয়ে এসেছে'। দিব্য শরীর মানে দেবতাদের শরীর নয়, দিব্য শরীর হল অপ্রাকৃত শরীর, যে শরীর স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের বাইরে। শ্রীকৃষ্ণ কি এতই বোকা ছিলেন, যিনি ভগবান, যিনি এত সুন্দর দেখতে, যিনি পরে সত্যভামা, রুক্মিনীর মত মেয়েদের বিয়ে করছেন তিনি কিনা গ্রামের যে মেয়েরা দুধ দুইত তাদের সাথে লীলা খেলার নামে পাগলামি করতে গেছেন! কিন্তু চিদানন্দময়ী শরীর যখন এসে যাবে তখন তার সৌন্দর্য অন্য রকম হয়ে যাবে। সেই সৌন্দর্য আর পার্থিব সৌন্দর্যের মধ্যে থাকবে না, নৈসর্গিক হয়ে যাবে। কিন্তু পরীক্ষিতের মনে এই প্রশ্নটা এসেছে কি করে এটা সম্ভব হয়।

শুকদেব তখন পরীক্ষিৎকে উত্তর দিচ্ছেন। 'হে পরীক্ষিৎ! তোমাকে এর আগেও বলেছি শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্বদা দ্বেষ ভাব রাখত, তা সত্ত্বেও শিশুপালের শরীর যখন চলে গেল তখন তার অন্তরতম শরীরটা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মিলে গেল'। মহাভারতে এর খুব ভালো বর্ণনা আছে, শিশুপালের শরীর চলে যেতেই সেই শরীর থেকে একটা তেজ বেরিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে গেল। শুকদেব বলছেন 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ করে শিশুপালেরই যদি এই রকম হয়ে থাকে আর গোপীরা যারা শ্রীকৃষ্ণকে এত ভালোবাসত, তাদের কেন কৃষ্ণময় শরীর হতে পারবে না'। শুকদেব এরপর কয়েকটি খুব জটিল শ্লোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দার্শনিক তত্ত্ব বলছেন 'প্রকৃতির সম্বন্ধিত যা কিছু আছে, বৃদ্ধি, বিনাশ, প্রমাণ, প্রমেয় আর গুণ-গুণী এই ভাবগুলো ভগবানের মধ্যে থাকে না'। ভালো খাওয়া-দাওয়া করলে শরীর মোটা হবে, ভালো খাওয়া-দাওয়া করছে না শরীরটা রোগা হতে থাকবে। এই শরীর দিয়ে আমি জগতকে জানতে পারছি, আমি জ্ঞাতা আর জগৎ জ্ঞেয়। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, গুণ-গুণী এই সম্পর্কগুলি ভগবানের সাথে থাকে না। তিনিই সব কিছুর আশ্রয়। রাসলীলার সময় যা কিছু হয়েছে তিনি নিজেই এইগুলোকে তাঁর দিব্য শক্তি দিয়ে সামনে নিয়ে এসেছেন। কেন নিয়ে এসেছেন? যাতে রাসলীলার সাহায্যে জীব তার পরম কল্যাণ সাধন করতে পারে। হে পরীক্ষিৎ! তুমি যদি পুরো রাসলীলাকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখ তাহলে তুমি সব কিছু গুলিয়ে ফেলবে। গীতার উপদেশ যেমন ভগবান মানব কল্যাণের জন্য দিয়েছেন ঠিক তেমনি ঈশ্বরের প্রতি পরমভক্তি, প্রেমাভক্তি, অবৈধ ভক্তি কেমন হতে পারে, মানব কল্যাণের জন্য তিনি লীলার জন্য এই রাসলীলা করেছেন। এখানে গোপীদের ভালোবাসা বা গোপীদের সন্তুষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের যে ভালোবাসা, সেটাকে অবলম্বন করে তিনি নিজের লীলাকে প্রকট করলেন। গোপীদের আকর্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণ দেখাচ্ছেন ভগবানের প্রতি প্রেমাভক্তি যখন হয় তখন সেটা কি রকম হয়।

*কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ। নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে।।*১০/২৯/১৫। ভাগবতের এটি একটি খুব উল্লেখযোগ্য শ্লোক। আমরা ধরে নিচ্ছি ব্রহ্মাণ্ড পুরান ভাগবতের পড়ে রচিত, আর ব্রহ্মাণ্ড পুরানের একটি অংশ হল অধ্যাত্ম রামায়ণ। অধ্যাত্ম রামায়ণে হনুমান রাবণকে বারবার বৈরী ভাবে সাধন করতে নিষেধ করছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ খুব উচ্চাঙ্গের শাস্ত্র, এতে নেতিমূলক কোন ভাব নেই সবটাই খুব ইতিবাচক। বাল্মীকি রামায়ণ বা তুলসীদাসের রামচরিতমানসে খারাপ অনেক কিছু আছে কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে খারাপ বলে কিছু নেই। এমনকি রাবণের

চরিত্রকে দেখান হয়েছে যে রাবণ বৈর ভাবে সাধন করছে। অধ্যাত্ম রামায়ণের ঐ বৈরভাবের যে সাধনা তারই মন্ত্র প্রথমে ভাগবতেই এখানে এসে গেছে। ঈশ্বরের প্রতি কোন একটা ভাব অবলম্বন কর। ঠাকুরও বলছেন একটা ভাবকে আশ্রয় করে ভাবকে পাকা কর। এখানে কি কি ভাবের কথা বলা হচ্ছে? কাম বা ক্রোধ বা ভয়। কিন্তু এই কাম, ক্রোধ ও ভয়ের ভাব ভালো নয়। ঠাকুর বলছেন বাড়িতে সদর দরজা দিয়েও প্রবেশ করা যায় আবার পেছনের নোংরা ফেলার রাস্তা দিয়েও ঢোকা যায়। এই ভাবগুলো পেছনের রাস্তা। হনুমান তাই বারংবার রাবণকে বৈরভাবে সাধন করতে নিষেধ করছেন। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আগে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এই কথা শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন। যদি বৈরভাবেও সাধন কর তাহলেও তুমি সব সময় কৃষ্ণ কৃষ্ণই দেখবে আর মরার পরও কৃষ্ণই দেখবে। কিন্তু এই পথটাকে ভালো পথ বলা হয় না এবং কখন করার জন্য উপদেশও দেওয়া হয় না। উচ্চ আদর্শের যখন পতন হয় তখন খুব খারাপ হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য এমন আদর্শ মানুষের সামনে রাখা হয় যেটাতে পতন হয়ে সমাজে যাতে কোন গোলমাল না হয়ে যায়। কারণ সমাজে সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও আছে।

আমরা বলি বটে সব কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়, কিন্তু আমি যখন কোন জিনিষ অনুভব করছি, চিন্তা করছি, সবটাই বুদ্ধি দিয়ে হচ্ছে। যেমন আমার আজ কিছু অঘটন হয়ে গিয়ে সব কিছু শেষ হয়ে গেল। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর বলছি তাঁর ইচ্ছাতেই হল আমার আর কি করার আছে। কিন্তু আগে কেন বোধ হয়নি যে তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে? কারণ আমার মন যেটা বুদ্ধি দিয়ে চলছে এটা একটা রঙিন চশমার মত। ঐ যে শুদ্ধ আলো আসছে সেটা ঐ রঙিন কাঁচের মধ্যে দিয়ে আসছে। সিনেমার প্রজেক্টরের মধ্যে ফিল্মের রীল ভরা আছে, এখন প্রজেক্টরের ভেতরে যখন শুদ্ধ আলোটা পড়ে তখন সেই আলোটা যখন রীলের মধ্যে দিয়ে স্ক্রীনে পড়ছে তখন সেখানে আলোটা অন্য রকম দেখাচ্ছে। এই যে ছবিটা এখন স্ক্রীনে দেখাচ্ছে এটাই হল আমার কোন জিনিষের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা। ঠাকুর বলছেন মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। কেন মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে? আমি যে রকম আহরণ করব সেটাই তো বেরোবে। আমি যে রকম চিন্তা ভাবনা করেছি, মনকে যে রঙে ছুপিয়ে রেখেছি আলোটাও সেই রকম দেখাবে। রোজ সকাল সাতটায় আমার চা খাওয়ার অভ্যাস। ঠিক সাতটায় কাজের লোকটি আমাকে চা দিয়ে যায়। একদিন সাতটা দশ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও চা দিয়ে যায়নি। আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। সাতটা পনেরোতে এসে চা নিয়ে আসতেই কাজের লোকটিকে আমি দুটো কথা শুনিয়ে দিলাম। পরে জানা গেলে কি একটা জরুরি কাজে আমার বাবা কাজের লোকটিকে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। তারও কিছু পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছিল যার জন্য সাতটায় চা দিয়ে যেতে পারেনি। আমি কেন প্রথমে এই দেরী করাটাকে মানতে পারলাম না? কারণ আমার মানসিক প্রস্তুতি যে ভাবে হয়ে রয়েছে সেই অনুসারে সাতটা বেজে গেছে কাজের লোকটি এখন আমার জন্য চা নিয়ে আসবে। এই পরিস্থিতির রঙে আমার মনটা ছোপান হয়ে আছে। কারুর বাড়িতে কেউ মারা গেছে, চুরি হয়ে গেছে, ব্যবসায় ক্ষতি হয়ে গেছে, চাকরি চলে গেছে এই সব পরিস্থিতিতে মন বুদ্ধি যদি একেবারে পরিষ্কার থাকে তখন প্রথম থেকেই মনে হবে সব তাঁর ইচ্ছা তাই এই রকম হয়েছে। কিন্তু প্রজেক্টরের আলোর সামনে রীল চলে আসছে তখন আলোটা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরে দেখছি আসলে যে রকম আসার কথা সেই রকম আসছে না, আমার মনের রঙের সাথে মিল খাচ্ছে না। সেইজন্য বলছেন যে ভাবেই পার ভগবানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক করে নাও। যদিও এখানে কাম, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি সব কিছু দিয়েই ভগবানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু এগুলোকে নিন্দা করা হয়। সমাজের সামনে এগুলোকে দেওয়া যায় না, কারণ সমাজের নিজের যেই রকম বুদ্ধি সেই রকমই দেখছে, এই সম্পর্কগুলো মিলবে না বলে একটু উচ্চ ভাবের সম্পর্ক তৈরীর কথা বলা হয়। যেমন তুমি সত্য অনুশীলন কর। কেন সত্য অনুশীলন করবে? ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। তাই তুমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাক। এতে কি হবে? তোমার ঈশ্বর লাভ তো হবেই সাথে সাথে সমাজেরও মঙ্গল। ঈশ্বরের জন্য তুমি সব ত্যাগ কর। এতে কি হবে? এখানেও ঈশ্বরকে সে পাবে আর তার সাথে সমাজেরও উন্নতি হয়। তাই এমন আদর্শ তুলে ধরতে হয় যাতে সমাজের সাধারণ মানুষেরও মঙ্গল হয়।

মনের মধ্যে যে বৃত্তিগুলো আছে এই বৃত্তিগুলোকে যখন ভগবানের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়, যেমন গীতায় ভগবান বলছেন *যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ* - যা কিছু করছ, যা কিছু খাওয়া-দাওয়া করছ, যা যজ্ঞ করছ, যা দান করছ তার ফল সব আমাকে দিয়ে দাও। তার মানে যত রকমের বৃত্তি আছে সব আমার সাথে মানে ঈশ্বরের সাথে জুড়ে দাও। ভগবানের সঙ্গে এই বৃত্তিগুলো জুড়ে দিলে এই বৃত্তি গুলোই ভগবন্নময় হয়ে যায়, কৃষ্ণময় হয়ে যায়। কৃষ্ণময় যখন হয়ে যায় তখনই ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়। যোগের দৃষ্টিতে দুই রকমের চৈতন্য লাভ হয় – একটা হল সগুণ সাকার বৃত্তি। যখন ঠাকুর মা কালীর ধ্যান করছেন তখন তিনি সব কিছুতেই মা কালীকেই দেখছেন। এটা হল শেষ বৃত্তি, একটাই বৃত্তি থেকে যাচ্ছে, কৃষ্ণময়। যিনি ঠাকুরের মন্ত্র নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্র জপ করে যাচ্ছেন তখন তাঁর পুরো মনটা রামকৃষ্ণময় হয়ে গেছে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাইরে আর কিছু দেখছেন না। তার মানে ঐ প্রজেক্টরের আলো আসছে সেখানে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি

রাখা আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি ছাড়া আর কিছুই আসছে না। তখন দেখে এই পাখা কেন ঘুরছে? ঠাকুরই ঘোরাচ্ছেন। এরা কারা? শ্রীরামকৃষ্ণ। সব কিছু শ্রীরামকৃষ্ণময়। যখন আরেক ধাপ উপরে যদি চলে যেতে চায় তখন এই একটা বৃত্তি শ্রীরামকৃষ্ণময়তা যেটা এখন রয়েছে সেটাকেও শান্ত করতে হয়। যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃত্তিটাকেও প্রশমিত করে দেবে তখনই শুদ্ধ নিরাকার ভাব চলে আসে। তখন কি থাকে সেটা আর মুখে বলা যায় না। কারণ বৃত্তিই নেই, ঢেউ আর জল এক হয়ে গেছে। সেইজন্য এই অবস্থাটাকে শব্দ দিয়ে বলে নিরাকার। গোপীদের যে কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা তাতে তারা কৃষ্ণময় হয়ে গেছে। সুতরাং গোপীদের যে ঈশ্বর দর্শন হবে এতে সন্দেহের কিছু নেই।

শুকদেব খুব সুন্দর কথা বলছেন *ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্যো ভবতা ভগবত্যজে। যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্ বিমুচ্যতে।।*১০/২৯/১৬। 'পরীক্ষিৎ! তুমি তো সাধারণ লোক নও, তুমি পরম ভাগবতত্ত্বের রহস্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ নও। তুমি কেন বিস্মিত হচ্ছ! যোগীরাই কত কিছু করে দিতে পারেন আর তিনি হলেন যোগেশ্বরেরও যোগেশ্বর, তিনি অজর, তাঁর জন্মই হয়নি, তিনি এই রকম জিনিষ করে দেবেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। কাঁচা গেঁয়ো লোক এই রকম প্রশ্ন যদি করে শ্রীকৃষ্ণ এটা কি করে করলেন, বাঁশিতে একটা ধ্বণি দিতেই ব্রজের সব মেয়েরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটে চলে গেল, তাহলে মানা যায়। কিন্তু তুমি কি করে এই প্রশ্ন করছ! তোমার মন বিকশিত, তুমি জান শ্রীকৃষ্ণ শুধু যোগেশ্বরই নন, তিনি যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর, তাঁর পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। কি সম্ভব? সাধারণ মানুষের যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা সেই ভালোবাসাকে তিনি করে দিলেন কৃষ্ণময়। কৃষ্ণময় বৃত্তি যখন হয়ে গেল তখন তার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরটা খসে গিয়ে বেরিয়ে এল চিদানন্দময়ী শরীর। তারপর শুরু হল রাস'। এই জায়গাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার মানে, শ্রীকৃষ্ণের স্থূল শরীর আর গোপীদের স্থূল শরীরে লীলা খেলা হচ্ছে না। শ্রীকৃষ্ণ চিদানন্দময় শরীর আর গোপীরা শুদ্ধ চৈতন্যময় চিদানন্দময়ী শরীর ধারণ করে এখন রাসলীলা করবেন। এর বাইরে বাকী যা কিছু আছে সেগুলো সবই মানবীয় কিন্তু শরীর শুদ্ধ চৈতন্যময়। এই ব্যাখ্যা ভাষ্যকাররা দিচ্ছেন না, মূল ভাগবতেরই এই ব্যাখ্যা। দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে পূজো করার সময় ঠাকুর দেখছেন কোশাকুশিও চিন্ময়। ঠিক তেমনি গোপীরা যে শরীরে রাসলীলা করেছে এটা মানবীয় শরীর নয় এটা চিন্ময় শরীর। পরীক্ষিৎকে শুকদেব এই সব বলে বলছেন 'পরীক্ষিৎ তোমার এই প্রশ্ন করা ঠিক নয়। তাঁর চোখের চাহনিতেই জগতের কল্যাণ হয়ে যায়, সেখানে গোপীদের মনের বৃত্তিটাই যে পুরো পাল্টে যেতে পারবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এইসব বলার পর শুকদেব আবার শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করে বলছেন – *স্বাগতং বো মহাভাগা প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ। ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্।।*১০/২৯/১৮। গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ স্বাগত করছেন। স্বাগত করে ভগবান বলছেন 'তোমরা মহাভাগ্যবতী, তোমাদের প্রসন্ন করার জন্য আমি তোমাদের কোন্ প্রিয় কাজ করব বল। তোমাদের সবার কুশল তো? আমি এখানে নির্জনে বসে নিজের মনের মত বাঁশি বাজাচ্ছি কিন্তু হঠাৎ করে তোমাদের এখানে আগমনের কি কারণ? ব্রজে সব কিছু ঠিক আছে তো? তবে কি জান – *রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা। প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সমধ্যমাঃ।।*১০/২৯/১৯। এত রাতে এমনিতেই ভয়ের সময়, তাছাড়া হিংস্র জন্তুরাও খাদ্যের অন্বেষণে বিচরণ করছে, এই সময় তোমাদের মত সুন্দরী ললনাদের এখানে অবস্থান করা একেবারেই নিরাপদ নয়। যদি তোমাদের জন্য কোন প্রিয় কাজ করার কথা বলার জন্য এসে থাক তাহলে বল আমি করে দিচ্ছি। আর ব্রজে যদি কিছু গোলমাল হয়ে থাক তাও বল আমি সেটাও মিটিয়ে দিচ্ছি। আর এমনিই যদি বেড়ানোর উপলক্ষে যদি বেরিয়ে থাক তাহলে বলছি এই সময়টা কোন নারীর পক্ষেই মঙ্গল নয়, তাই তোমরা সত্বর ব্রজে ফিরে যাও। শুধু তাই নয়, *মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ। বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্।।*১০/২৯/২০। এই সময় তোমাদের গৃহে না দেখতে পেয়ে তোমাদের মা, বাবা, সন্তান, স্বামী, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি স্বজনরা নিশ্চয়ই তোমাদের খুঁজতে শুরু করেছেন। তোমাদের না দেখতে পেয়ে পরিবারের স্বজনরা চিন্তিত হয়ে পড়বে। সেইজন্য তোমরা এক্ষুণি সবাই ফিরে যাও'। এখানে শুধু যে কুমারীরাই এসেছে তা নয়, স্ত্রীরা, মায়েরাও এসেছে।

এত কথা বলা পরেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্। যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্।।*১০/২৯/২১। অবশ্য আজকের রাতটা এই বনের শোভা অপূর্ব এবং শোভনীয় তাতে সন্দেহ নেই। চারিদিকে গাছে গাছে পল্লবে পল্লবে ফুল প্রস্ফুটিত। পূর্ণিমার স্নিগ্ধ কিরণে বনভূমি প্লাবিত, যমুনার জল স্পর্শ করে সমীরণ ধীর গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে সত্যিই যেন আশ মিটতে চায় না। তবুও বলি এই দৃশ্য তোমাদের সব দেখা হয়ে গেল এবার সবাই ব্রজে ফিরে যাও। তোমরা সবাই ভালো বংশের মেয়ে, তোমরা সবাই সতী সাধ্বী রমণী, গৃহে ফিরে গিয়ে নিজের স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ি, বাবা-মার সেবা কর। আর তবে যদি আমার অনুরাগে, আমার প্রতি ভালোবাসার টানে যদি এখানে এসে থাক তাতেও তোমরা অনুচিত কিছু করোনি। কারণ জঙ্গলের পশুপাখিরাও

আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু *ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্মো হ্যমায়য়া। তদ্বন্ধুনাং চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণম্।।* ১০/২৯/২৪। হে কল্যাণী গোপীগণ! স্বামী এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনদের আন্তরিক ভাবে অকপটে সেবা করা এবং সন্তানদের পালন পোষণ করাই স্ত্রীদের পরম ধর্ম। সেইজন্য তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। কুলস্ত্রীর পক্ষে উপপতির সেবা করা সর্ব প্রকারে অত্যন্ত নিন্দনীয়, এর থেকে নিন্দার আর কিছু হতে পারে না। এতে তাদের পরলোক নষ্ট হয়, স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না আর এই লোকে চরম অপযশ পায়। একেই এই কুকর্মের সুখ ক্ষণিক, বর্তমানে এই কর্ম কত কষ্টকর। যারা নিজের স্বামীকে ছেড়ে অপরকে ভালোবাসে তাদের কত লুকিয়ে চুরিয়ে মনের মধ্যে ধরা পড়ার ভয়, আর ধরা পড়লে কলঙ্ক হবে এই আশঙ্কা নিয়ে উপপতির সাথে প্রেম করতে হয়। তাই বলছি তোমরা সবাই ব্রজে নিজের নিজের গৃহে ফিরে যাও। *শ্রবণাদ্ দর্শনাদ্ ধ্যানান্ময়ি ভাবোহনুকীর্তনাৎ। ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্।।*১০/২৯/২৭। আরও বিশেষ কথা এই যে, আমার রূপ, গুণ-লীলার দর্শন করে, শ্রবণ করে কীর্তন করে এবং আমার ধ্যানের দ্বারা আমার প্রতি যে অনুরাগ ভক্তি জন্মায় আমার সান্নিধ্যে তা হয় না। সুতরাং তোমার এখন নিজের নিজের গৃহে ফিরে যাও। এইসব কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের উপেক্ষা করে এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

ভগবান গোবিন্দের এই মর্মভেদী অপ্রিয় কথা শুনে গোপীদের কি অবস্থা হল ব্যাসদেব খুব সুন্দর কাব্যিক বর্ণনা দিচ্ছেন। শুকদেব বলছেন 'শ্রীকৃষ্ণের এই মর্ম বিদীর্ণ অপ্রিয় বাক্য শুনে গোপীদের বিষাদের আর সীমা রইল না। দুঃখ আর হতাশায় গোপীদের নিঃশ্বাস এত উষ্ণ হয়ে গেছে যে তাদের ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হয়ে গেছে। কাজল মিশ্রিত অশ্রুজল বিগলিত ধারায় অঝোরে ঝরে পড়ছে যে তাদের গালে কালো দাগ হয়ে গেছে। এত কষ্ট করে যাঁর জন্য সব কিছু ছেড়ে ছুটে এসেছি তিনিই আমাদের উপেক্ষা করে এই ধরণের অপ্রিয় বাক্য বলে আমাদের ফিরে যেতে বলছেন। এবার গোপীরা ভগবান গোবিন্দকে বলছেন *মৈবং বিভোহর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্। ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্ দেবো যথাহহদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্।।*১০/২৯/৩১। 'হে বিভু! তুমি সর্বব্যাপী, তুমি নিখিলজীবের অন্তর্যামী ভগবান। তাই আমাদের হৃদয়ের কি ভাব সেটা তুমি ভালো ভাবেই জান। সেইজন্য এমন হৃদয়হীন কঠোর ব্যবহার করা তোমার পক্ষে অনুচিত। জগতের সব রকম সুখ ত্যাগ করে আমরা তোমার চরণমূলে শরণ নিতে এসেছি। ভালোবেসে আমরা তোমাকেই বরণ করেছি। তবু এও জানি যে তোমার ওপর আমাদের কোন দাবীই চলবে না, তুমি সমস্ত সাধনারও দুর্লভ, তুমি স্বতন্ত্র, কোন বাঁধনেই তোমাকে বাঁধা যায় না। তোমার অকারণ কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা। যেমন আদিপুরুষ ভগবান তাঁর কৃপা দ্বারা মুমুক্ষুগণকে গ্রহণ করেন তেমনি তুমি আমাদের ছেড়ো না এই প্রার্থনাটা টুকু তুমি রাখ'।

রাসলীলার অনুধ্যানের সময় আমাদের একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে। পুরানের উদ্দেশ্য হল বেদের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করা। সৌন্দর্যের বা অন্য কিছুর ব্যাখ্যা করা পুরানের কাজ নয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, যদিও এই কাব্যগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার লীলা আধারিত কিন্তু গীতগোবিন্দের সেই স্থান নেই যে স্থান ভাগবতের রাসলীলার পেয়েছে। ভাগবতের রাসলীলাতে সাধারণ জাগতিক ব্যাপারগুলোও নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু সেটাকেও আধ্যাত্মিকতায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাসলীলাতে গোপীদের প্রারম্ভিক অভিব্যক্তিকে মনে হবে যেন জার প্রেম, নিজের স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের আকর্ষণে ছুটে এসেছে। কিন্তু সেই জারপ্রেমকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার দিকে। এখানে গোপীরা কি বলছে *সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্,* সব কিছু পরিত্যাগ করে আমরা আপনার চরণমূলে আশ্রয় নিয়েছি। ঈশ্বর প্রেমিক ভক্ত এইটাই চায় আর ভালোবাসার ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ হয়। গোপীরা বলছেন 'হে কৃষ্ণ! তুমি স্বতন্ত্র, তুমি দুরবগ্রহ অর্থাৎ তুমি যেটা করব বলে ঠিক কর সেটাই কর। তোমার এই স্বভাব আমরা তোমার শৈশব থেকেই দেখে এসেছি, আর এত দিনে দেখে নিয়েছি যে তোমার উপর আমাদের কোন কিছুই চলে না'। সমুদ্র মন্থনের সময় ঠিক এই জিনিষটাই হয়েছিল। সমুদ্র মন্থনে প্রথমে হলাহল তারপর এক এক করে উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত ইত্যাদি বেরিয়ে আসার পর লক্ষ্মীদেবী বেরিয়ে এলেন। লক্ষ্মীদেবী বেরিয়ে এসেছেন। এখন তাঁর একজন পতির আবশ্যক। তিনি বিষ্ণুকে পতি রূপে বরণ করে নিলেন। সেখানে অত দেবতা আর বলশালী অসুররা থাকতে লক্ষ্মীদেবী কেন বিষ্ণুকেই বরণ করলেন? বলছেন লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাবের পর একমাত্র বিষ্ণুই লক্ষ্মীদেবীর ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাননি। লক্ষ্মীদেবীর ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। এটা দেখা যায় মেয়েরা চায় পুরুষ সব সময় তার কথা মত চলুক। কিন্তু এটাও আশ্চর্যের, যে পুরুষ মেয়ের কথা মত চলে সেই পুরুষকে মেয়েররা একেবারেই পছন্দ করবে না। গোপীরা এইটাই বলছে 'হে পরমপ্রিয় প্রাণবল্লভ! তুমি তো কোন দিন আমাদের কথা মত চললে না, আর চলবেও না। কারণ তুমি এই রকমই'। এগুলো কোন জাগতিক কথা নয়, এটাই বাস্তব। পুরুষের ঠিক ঠিক ব্যক্তিত্ব হল সে নিজের মত চলবে, কারুর কথায় সে ওঠা বসা করবে না। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা অন্য, পুরুষ মাত্রই কোন নারীর কথায় চলবে না, আর তুমি হলে সেই আদিপুরুষ, সুতরাং কারুর কথায় চলার কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু

আদিপুরুষের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তিনি হলেন *ভক্তা ভজস্ব*। গোপীরা তাই বলছে 'তুমি আদিপুরুষ হতে পার কিন্তু যে তোমার ভক্ত তার প্রতি তো তুমি কৃপা কর। তোমার ভক্তের প্রতি তুমি যেভাবে কৃপা কর ঠিক সেই ভাবে তুমি আমাদের প্রতি কৃপা কর'। এই শ্লোকটাকে আমাদের মাথায় খুব ভালো করে বসিয়ে না নিলে রাসলীলার পুরো ভাবটা হারিয়ে যাবে। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রথমে প্রিয়া প্রিয়তমের ভাব নিয়েই এসেছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সমস্ত রকমের বৃত্তিকে নিবৃত্ত করে দিচ্ছেন, যদি কোথাও গোপীদের মধ্যে সামান্যতম কাম ভাব, চঞ্চলতার ভাব থেকে থাকে তাই আগেই এই ভাবের বৃত্তিগুলোকে নাশ করে দিচ্ছেন। কিভাবে? *দেবো যথাহহদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্*, আদিপুরুষ নারায়ণ মুমুক্ষুদের প্রতি যেমনটি কৃপা করেন, তুমিও ঠিক সেইভাবে আমাদের কৃপা কর, কারণ তুমিই সেই আদিপুরুষ। এখানে বোঝা যাচ্ছে যে গোপীদের এই বোধ আছে যিনি আদিপুরুষ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন। রাসলীলার প্রারম্ভিক পর্যায়েই এই কথা গোপীরা বলছেন।

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন *যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্। অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।*।১০/২৯/৩২। 'হে প্রিয়তম শ্যামসুন্দর! তুমি যে বলছ নিজের স্বামী, পুত্র, ভাই, ভ্রাতা, বন্ধু এদের সেবা করাই আমাদের পরম আদর্শ, তোমার এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তুমিই তো ধর্মের রহস্য জান'। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে গোপীরা বলছেন ধর্মজ্ঞ। মহাভারতে যেখানে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেখানেও অনেক ধর্ম সঙ্কট মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ এসে বিধান দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণই ঠিক ঠিক ধর্মজ্ঞ, ধর্ম সঙ্কট বলে তাঁর কাছে কিছু ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের এটি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের সবার একটা ভাসা ভাসা ধারণা। সেইভাবে আমরা কখনই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র নিয়ে অনুধ্যান করি না। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীদের সাথে লীলা করেছেন, কংসকে বধ করেছেন আর কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথি হয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। এটুকুতেই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র শেষ হয়ে যায় না। তিনি ছিলেন ধর্মজ্ঞ, ধর্ম সঙ্কট বলে তাঁর কিছুই ছিল না, সর্বদা তিনি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। তিনি জানেন কোনটা ঠিক, কোনটা ঠিক নয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কোনটা করা ঠিক, কোনটা করা ঠিক নয় এই সংশয় তাঁর কখনই ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন ধর্মজ্ঞাতা। গোপীরা এটাই বলছেন 'আপনি হলেন ধর্মবিদা, মানে ধর্মজ্ঞ। সেই অনুসারে আপনি বলছেন *স্ত্রীণাং স্বধর্ম* হল স্বামী, পুত্র, ভাই, পিতা-মাতার সেবা করা। তা আপনিতো ঠিকই বলছেন। স্ত্রী ধর্ম পালন করার তোমার এই কথাকে যদি আমাদের পালন করতেই হয় তাহলেও কিন্তু আমাদের তোমার কাছেই আসতে হবে। আর এটাই ঠিক ঠিক স্ত্রীর স্বধর্ম পালন করা হবে। কারণ *প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা*, যত শাস্ত্র আছে, যত উপদেশ আছে তার শেষ কথা হল তুমি, যেহেতু তুমি সাক্ষাৎ ভগবান। আর জগতের সমস্ত দেহধারীর তুমি সুহৃৎ, আত্মা, পরমপ্রিয়'। সংস্কৃতে খুব সুন্দর একটা প্রার্থনা আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি *ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব*, হে ভগবান! তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু তুমিই ভ্রাতা, তুমিই সব কিছু আমার। গোপীরা বলছে 'তুমি আমাদের যে উপদেশ দিয়েছ আমরা তোমার সেই উপদেশই পালন করছি। তুমি আমাদের স্ত্রী ধর্ম পালন করতে উপদেশ দিচ্ছ, স্ত্রী ধর্ম পালন করতে গিয়ে তুমি স্বামী, পুত্র, ভাই, পিতা-মাতার সেবা করতে বলছ। কিন্তু তুমিই সেই আদিপুরুষ, তুমিই স্বামী, তুমিই ভ্রাতা, তুমিই আমাদের মা-বাবা, এইভাবেই তো আমরা তোমাকে দেখে এসেছি। সেইজন্য তুমি বল তোমাকে ছাড়া আমরা কার সেবা করব। তাই তোমাকে সেবা করেই আমরা আমাদের ধর্ম পালন করছি। কারণ তুমি ভগবান, তুমিই শেষ কথা তাই তোমার সেবাই আমাদের পরম ধর্ম। সেইজন্য আমরা অধর্ম কিছু করছি না'। গোপীরাও বুদ্ধিমতি ছিল, শ্রীকৃষ্ণের কথাকেই ঘুরিয়ে শ্রীকৃষ্ণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

স্বধর্ম সম্বন্ধে মহাভারত, মনুস্মৃতিতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজের প্রতি, কর্মস্থলে, সংসারে মা-বাবার প্রতি, সন্তান, স্ত্রী, স্বামী, বন্ধু, জাতি, বর্ণ সবার প্রতি এমনকি নিজের প্রতি আমাদের কিছু কর্তব্য কর্ম নির্ধারিত হয়ে আছে, এই কর্মগুলোকে পালন করাই স্বধর্ম। সন্ন্যাসীর কাছে ভগবানই সব কিছু, তাঁর আত্মাও ভগবান আর তাঁর সম্বন্ধীও ভগবান, প্রিয়জনও ভগবান, ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই। সেইজন্য সন্ন্যাসী একটাই কর্তব্য ভগবানের নাম করা। ভগবানের নাম করা ছাড়া তাঁর আর কোন কর্তব্য নেই। গোপীরা তাই বলছেন 'তোমার কথা মতই আমরা চলছি, তুমি সবারই সুহৃৎ, ভালোবাসার শেষ কথা তুমি, আর আমরা তোমারই সেবা করছি।

কুর্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্ নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্। তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা আশাং ভৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র।।১০/২৯/৩৩। শুধু তাই নয়, যাঁরা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা তোমাকেই ভালোবাসেন। কারণ তুমি নিত্যপ্রিয়, জ্ঞানীর আত্মা তুমি আবার ভগবানের আত্মা জ্ঞানী, সেইজন্য তাঁরা তোমাকেই ভালোবাসে। তাই এই অনিত্য দুঃখদায়ী পতি-পুত্রকে ভালোবেসে আমার কি হবে'? এর আগে শ্রীকৃষ্ণ যে স্ত্রীণাং স্বধর্মের

কথা বললেন, কিছু কিছু ভাষ্যকারের মতে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিকে সাধারণ জীবনে যারা পরে আছে তাদের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু গোপীরা সাধারণ ছিলেন না, তাদের ভাষাই বলে দিচ্ছে তারা কত উচ্চমার্গে ছিলেন। ঠাকুরের কাছে এক পাগলী এসে ঠাকুরকে বলত 'ওগো! তোমার মন থেকে আমাকে ঠেলে দিচ্ছ কেন'? শুনে ঠাকুর বলছেন 'ওরে হৃদু! এ যে দেখছি ঠেলাঠেলির ব্যাপার চলছে'। এখানে এই পাগলীর সেই ভাব নেই, অথচ গোপীরা কি ভাষা ব্যবহার করছে – যাঁরা আত্মজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠতম তাঁদেরও আত্মা তুমি, সেইজন্য তাঁরা তোমাকে ভালোবাসে। আর স্বামী, পুত্র, ভাই, বন্ধু সবই অনিত্য। অনিত্যকে ভালোবেসে কখন কেউ সুখী হতে পারেনা। অনিত্য দুঃখ ছাড়া আর কিছুই দেয় না। ঠাকুর বলছেন সবাই নিজের মাগের সুখ্যাতি করে, কেউ বলে না যে তার স্ত্রী খারাপ। অথচ সমাজে চারিদিকে দাবানল জ্বলছে, দুঃখের কোন পরিসীমা নেই। গোপীরা তাই বলছে *তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা।* শ্রীকৃষ্ণকে গোপীরা দেহধারী মানব রূপে দেখছে না, পরমেশ্বর ভগবান রূপেই দেখছে। এটা কোন ভাষ্যকারের কথা নয়, মূল ভাগবতেরই বর্ণনা। সেইজন্য রাসলীলা, গোপীদের নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিকরা যে ধরণের কথা বলে সেগুলো অত্যন্ত বোকা বোকা লাগে। এখানে গোপীরাই শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন হে পরমেশ্বর। আপনি পরমেশ্বর তাই আপনি আমাদের উপর প্রসন্ন হন। আমরা চিরকাল ধরে তোমার প্রতি আমাদের এই ভালোবাসাকে সযত্নে পালন করে ধরে রেখেছি। চিরকাল বলতে গিয়ে গোপীরা বলছেন *চিরাদরবিন্দনেত্র*, চিরকাল বলতে এখানে জন্ম জন্মান্তর ধরে হতে পারে বা শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল থেকে হতে পারে। 'এত দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা মনের নিভৃতে এই ভালোবাসাকে কত আশা নিয়ে সুন্দর ভাবে লালন করে আসছি, তুমি এটাকে এইভাবে ছিন্ন করে দিও না'। ভক্ত যখন ভগবানের আরাধনা করে করে ঈশ্বরের দর্শন না পায় তখন যে ছটফটানিটা হয়, ঠাকুর যেমন মায়ের দর্শন না পেতে বললেন এই খড়্গ দিয়ে আমার গলাটা কেটে দেব। গোপীদের ঠিক সেই ভাবটাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। গোপীরা বলছেন 'এত দিন আমরা কোন রকমে মনকে সংসারের কাজে লাগিয়ে রেখেছিলাম, তখন হাতটাও গৃহকর্মেই লেগে থাকত। কিন্তু আজ আমাদের চিত্তের সবটাই বিনা আয়াসেই হরণ করে নিয়েছ, তাই হাতটাও সরে চলে এসেছে। তুমি সুখস্বরূপ, তাই তুমি সহজেই আমাদের মনটাকে টেনে নিয়ে এসেছ। এখন আমাদের পা দুটো তোমার কাছে থেকে সরার জন্য রাজী হবে না। আমরা চাইলেও সরতে পারব না। এখন আর কি করে আমরা ব্রজে ফিরে যাব? কারণ আমাদের মন চিত্ত সব এখন তোমার পায়ে পড়ে আছে। ব্রজে আর আমাদের ফিরে যাওয়া হবে না। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের আর কষ্ট দিও না।

এখানে শুকদেব একদিকে পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন অন্য দিকে তিনি গোপীদের মানসিক অবস্থার বর্ণনা করছেন। কোন জিনিষকে আমরা যখন দেখি তখন তাকে হয় বস্তু রূপে দেখি নয়তো ব্রহ্ম রূপে দেখি। কিন্তু সাধনার সময় কোন জিনিষকে বস্তু রূপে ত্যাগ করা হয় আর ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করা হয়। এটাই নেতি নেতি আর ইতি ইতি। ঠাকুর যখন টাকা হাতে নিয়ে টাকা মাটি মাটি টাকা বলে টাকাকে ফেলে দিচ্ছেন তখন তিনি বস্তু রূপে টাকাকে ত্যাগ করে দিচ্ছেন। আবার ব্রহ্ম রূপে গ্রহণও করছেন, যখন মনে হল মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন তাহলে খ্যাঁট বন্ধ হয়ে যাবে তখন তিনি বললেন মা তুমি হৃদয়ে বাস কর। অথচ শ্রীমার কাছে যখন কোন টাকা পয়সা আসত তখন তিনি সেটাকে মাথায় ঠেকিয়ে খুব সামলে রাখতেন। শ্রীমা টাকাকে টাকা বলে প্রণাম করছেন না, লক্ষ্মী রূপে প্রণাম করছেন, মানে ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করছেন। বস্তু রূপে সব সময় ত্যাগ হয় আর ব্রহ্ম রূপে সব সময় গ্রহণ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীদের রাসলীলাতে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এখানে প্রাথমিক পর্যায়ে গোপীদের শরীর মনকে বস্তু রূপে ত্যাগ করে এই শরীর মনকেই ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই বলা হল চিদানন্দময় শরীর। অথচ এর একটু পরেই একই সাথে দুটোই থাকছে, ব্রহ্ম রূপেও থাকছে আবার বস্তু রূপেও থাকছে। শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীদের রাসলীলাতে ব্রহ্ম রূপ আর বস্তু রূপ এই দুটোই চলছে। প্রথমে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন আমরা জানি তুমি সেই পরমেশ্বর, তোমার ভক্তের উপর তুমি যেমন কৃপা কর আমাদেরও সেই রকম কৃপা কর। যদিও রাসলীলাতে এমন সব কিছু আছে যা আমাদের আলোচনা করা সম্ভব নয়, কিন্তু মূল কথা হল তুমি আমাদের ভালোবাস। কিভাবে? দৈহিক ভাবে। একদিকে ভাব ব্রহ্ম রূপে রয়েছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণের শরীর চিদানন্দময় আর গোপীদের শরীর চিদানন্দময়ী, অন্য দিকে মিলন হচ্ছে। মিলনের বর্ণনাও সেই রকম ভাবেই দেওয়া হয়েছে। এখানে ব্রহ্ম রূপ আর বস্তু রূপ দুটোই এসে যাচ্ছে। ঠাকুরের জীবনেও ঠিক এই ভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম রূপ আর বস্তু রূপ যুগপৎ অবস্থিত ছিল, যখন মা কালী ঠাকুরকে বললেন 'তুই ভাবমুখে থাক'। ভাবমুখে থাকা মানে একদিকে ব্রহ্ম রূপও দেখতে পাচ্ছেন অন্য দিকে বস্তু রূপও দেখতে পাচ্ছেন। জগতের যে সত্তা সেটাকেও ঠাকুর চৈতন্যময় দেখছেন আবার ব্রহ্মই সব কিছু হয়েছেন সেটাও দেখছেন। এইটাই ভাবমুখের মূল তাৎপর্য। রাসলীলাতে গোপীরা যখন এই জায়গাটাতে অবস্থান করছেন তখন তাদেরও সেই একই অবস্থা, এটাই তখন ভাবমুখে থাকা। শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন পরমেশ্বর রূপে কিন্তু তাঁর সাথে প্রেম যেটা নিবেদন করছেন সেটা যেন জীবের ভাব এসে যাচ্ছে। জীবের ভাব কি করে আসতে পারে? জীবতো ঐভাবে

পরমাত্মাকে ভালোবাসতে পারেনা। সচারচর যখন বস্তু রূপ হয় তখন বস্তু রূপই দেখেন আর যখন ব্রহ্মস্বরূপ হন তখন ব্রহ্মস্বরূপই দেখেন। চৈতন্য সমাধিতে বস্তুও দেখছেন আবার ব্রহ্মও দেখছেন এই অবস্থা খুব বিরল। ঠাকুর বলছেন চৈতন্য সমাধি একমাত্র শুকদেবের হয়েছিল। এই জিনিষ সচরাচর হয় না, চৈতন্য সমাধিতে হয় তিনি ব্রহ্ম রূপে জগতকে উড়িয়ে বলবেন এই জগতটা মিথ্যা, আর তা নাহলে জগতটা সত্য হয়ে ব্রহ্মই মিথ্যা মনে হবে। কিন্তু ব্রহ্ম সত্যম্ আর জগৎ সত্যম্ এটা হবে না। এখানে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, তাঁকে পরমাত্মা রূপে দেখছেন অথচ তাঁর সঙ্গে আমরা কেলীক্রিড়া করব। এটাই রাসলীলার বিচিত্রতা। সেইজন্য রাসলীলার সার্বিক ভাবকে ধারণা করা খুবই কঠিন। উচ্চকোটির সাধক না হলে এই ভাবকে ধারণা করা খুব দুঃসাধ্য। যিনি ব্যাখ্যা করবেন তাঁকেও সেই রকম উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পন্ন হতে হবে।

জীবের মধ্যে যে জাগতিক প্রেমভাব সেটা সীমিত, এই প্রেম দিয়ে পরমাত্মাকে কখনই ভালোবাসা যায় না। কঠোপনিষদে যমরাজ বলছেন *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি*, শুদ্ধ জলে যদি শুদ্ধ জল মিশিয়ে দেওয়া হয় তখন সেটা এক রসত্ব প্রাপ্ত হয়ে যায়। রাসলীলাতে গোপীদের এখানে এই দুটো জিনিষই চলছে, একদিকে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর রূপেও দেখছেন আবার প্রিয়তম রূপেও দেখছেন। অথচ ঠাকুরের জীবনে আমরা বর্ণনা পাই, একবার ঠাকুর এই মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে গেছেন তখন তিনি আটকে গেছেন, কারণ তুমি এখন দেহ ধারণ করে আছ এখন এটা হবে না। তার মানে এখানে গোপীরা অন্য দেহে ছিলেন। কিন্তু মূল ভাব ঐটাই, ভাবমুখে থাকা।

এরপর গোপীরা বলছেন, বড় বড় ঐশ্বর্যশালী দেবতারা লক্ষ্মীদেবীর কৃপা কটাক্ষ পাওয়ার জন্য কত তপস্যা করেন। সেই শ্রীদেবী আবার নারায়ণের হৃদয়ে বাস করার অধিকারিণী। তা সত্ত্বেও লক্ষ্মীদেবী সপত্নী তুলসীকে হিংসা করেন, কারণ ভক্তপার্ষদবৃন্দ সেবিত আপনার ঐ কমলচরণেই তুলসীর স্থান। অধ্যাত্ম রামায়ণও এই ভাবটা ভাগবতের এই অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে। দেবতারা হলেন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, তাঁরা আরাধনা করছেন লক্ষ্মীদেবীর। লক্ষ্মীদেবীর কৃপা না হলে দেবতাদের কোন ঐশ্বর্যই হবে না। মহাভারতেও এই ধরণের কথার উল্লেখ আছে, বামন অবতারে বিষ্ণুর আদেশে বলিরাজ পাতালে চলে গেছেন। ইন্দ্র প্রজাপতিকে জিজ্ঞেস করছেন বলিকে কোথায় পাওয়া যাবে। প্রজাপতির কাছ থেকে খবর নিয়ে ইন্দ্র সেখানে গেছে যেখান বলি অবস্থান করছিল। ইন্দ্র দেখলেন বলির শরীর থেকে এক অতি সুন্দর স্ত্রী বেরিয়ে এসেছেন। ইন্দ্র জিজ্ঞেস করছেন আপনি কে। তিনি বললেন আমি লক্ষ্মী। লক্ষ্মী যখন বলিকে ছেড়ে ইন্দ্রের মধ্যে চলে গেল তখন অসুরদের সব শক্তি শেষ হয়ে গেল, এবার দেবতাদের শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকবে। আমাদের পরম্পরাতে বলা হয় লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করলে সুখ সমৃদ্ধি হয়। সেই লক্ষ্মী কোথায় থাকেন, তিনি তোমার বক্ষবিলাসিনী। সেই লক্ষ্মীদেবী, যাঁর সাধনা সবাই করছে, তিনিও মনের মধ্যে হিংসার জ্বালায় জ্বলছেন। কাকে তাঁর হিংসা? অতি সাধারণ এক তুলসীপাতাকে, যে কিনা লক্ষ্মীদেবীর সতীন। কেন তিনি তুলসীপাতাকে হিংসা করেন? কারণ তুলসীপাতাকে তোমার চরণকমলে দেওয়া হয়। তোমার চরণের এমনই মাহাত্ম্য যে, যিনি তোমার হৃদয়কমলে বাস করেন তাঁরও মনে শান্তি নেই, কারণ তোমার চরণে তিনি স্থান পাচ্ছেন না। তিনিও তোমার চরণকমলের রেণু কামনা করছেন। তোমার ভক্তরাও তোমারই চরণরজের আকাঙ্খী। সেইজন্য গোপীরা বলছেন 'ওগো দুঃখহারী! হে শরণাগতবৎসল! এবার আমাদের প্রতিও তুমি প্রসন্ন হও, তোমার চরণে আমাদের স্থান দাও। রূপৈশ্বর্যে সমৃদ্ধময়ী লক্ষ্মীদেবী যিনি তোমার বক্ষ সংলগ্না তাঁকে তুমি উপেক্ষা করে থাক সেখানে আমরা আর কোথাও। কিন্তু তোমার এই রূপ মাধুর্য, তোমার ঐ অপরূপ পাগল করা হাসি-মাখা চাহনি, তোমার ঐ মধুর বংশীধ্বণি শুনে জগতের কোন নারী আছে যে তোমার আকর্ষণে ছুটে আসবে না, তোমাকে ভালোবেসে পাগল হয়ে যাবে না। তুমি আমাদের প্রাণ দান কর, আমাদের গ্রহণ কর'। এইভাবে গোপীরা নানান ভাষায় তাঁদের অন্তরের প্রেমের আর্তি শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে যাচ্ছেন'

শুকদেব তখন বলছেন *ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ। প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোহপ্যরীরমৎ।।*১০/২৯/৪২। শুকদেব শ্রীকৃষ্ণকে বারবার যোগীশ্বরের ঈশ্বর বলে সম্বোধন করছেন। শ্রীকৃষ্ণ হলেন যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর। চার কুমার সনক, সনন্দন, সনৎ ও সনাতন, এঁদের মত প্রসিদ্ধ যোগীশ্বরদেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। আবার দেবাদিদেব মহাদেবকেও বলা হয় যোগীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ তাঁরও ঈশ্বর। সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপাঙ্গনাদের এই ব্যাথিত, ব্যাকুল আর্তিভরা আকুতি শুনলেন তখন তাঁরও হৃদয় করুণা রসে আপ্লুত হয়ে গেল। শুকদেব খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন – *প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোহপ্যরীরমৎ* ভগবান হলেন আত্মারাম। আত্মারাম মানে, যিনি নিজের আত্মার সাথেই রমণ করেন। যখন ভক্তির কথা আসে তখন বলা হয় *স আত্মারামো ভবতি*, তখন আনন্দ রসকে আস্বাদনের জন্য তাঁকে আর বাইরের কোন বস্তুর অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না, নিজের আত্মার আনন্দেই বিভোর হয়ে থাকেন। ভগবান হলেন চির আত্মারাম, কিন্তু সেই আত্মারাম গোপনারীদের করুণার বাণী শোনার পর তিনিও বললেন 'আমি তোমাদের সাথে আজ

ক্রীড়া করব'। ভগবান যে এখানে ক্রীড়া করবেন সেটা তাঁর নিজের কোন আনন্দের জন্য নয়, কারণ তিনিতো আত্মারাম, আপ্তকামস্য কা স্পৃহা, যিনি পূর্ণকাম তাঁর আবার কিসের স্পৃহা!

এই কথা বলার পরেই ভগবান তাঁর হাসি, তাঁর আচরণ-ভাবভঙ্গী সব গোপীদের মত করে দিলেন। এখানে এই অর্থও করা যেতে পারে তিনি সব কিছু গোপীদের মনের ইচ্ছার অনুকূল করে দিলেন। গোপীদের মনের মত করে দিতেই, গোপীদের যে মুখগুলো দুঃখে, বিরহে শুষ্ক বিষন্ন দেখাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে গোপীদের মুখমণ্ডলগুলি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। শত শত গোপবনিতাদের মধ্যে ভগবান এখন যূথপতিরূপে বিরাজ করছেন, গোপাঙ্গনরা সুস্বরে ভগবানেরই কীর্তিগাথা গান করছেন, আবার তিনিও গানের মাধ্যমে গোপীদের প্রেমমাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন, গলায় বনমালা। এইভাবে বনভূমির শোভা বর্ধণ করে গোপললনাদের সাথে নানান রকমের ক্রীড়া করে চলেছেন।

এর আগে আমরা বলছিলাম গোপীদের দুটি ভাব, একটি ভাব যেখানে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে দেখছেন তার সাথে শ্রীকৃষ্ণের মানবরূপ দুটোই দেখছেন। এতক্ষণ সবাই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর ঈশ্বর করে গেছেন। এখন যেই ক্রীড়া শুরু করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ একে এখানে আদর করছেন, ওকে সেখানে আদর করছেন। ব্যস্, মেয়েদের সব অহঙ্কার জাগতে শুরু করে দিয়েছে। গোপীরা মনে করছে শ্রীকৃষ্ণ এবার আমাদের হাতে বানর নাচ নাচবেন। গোপীরা মনে করছে আমাদের হাততালিতে শ্রীকৃষ্ণ এখন নাচছেন। শ্রীকৃষ্ণ যার দিকে একটু নয়নপাত করছেন, যাকে একটু আদর করছেন, তারা মনে করছে কৃষ্ণ শুধু আমাকেই ভালোবাসে, আমার মত জগতে আর কেউ নেই এই অহঙ্কার তাদের মধ্যে উদয় হল। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন গোপীদের মধ্যে অহঙ্কার জেগে গেছে তখন তিনি কি করলেন? *তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানং চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়তে।।*১০/২৯/৪৮। ভগবান যখন দেখলেন ব্রজরমণীরা গর্ববোধ করছেন তখন তিনি সেই গর্ব প্রশমনের জন্য সেইখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। গোপীরা আনন্দে নৃত্য করছেন হঠাৎ তাদের নজরে এল শ্রীকৃষ্ণ তাদের মাঝখানে নেই। যোগীরা যখন আকাশতত্ত্বের সঙ্গে এক হয়ে যান তখন তাঁদের মধ্যেও এই অন্তর্ধান হওয়ার ক্ষমতা এসে যায়। অনেকে এর ব্যাখ্যা করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের থেকে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে তা হচ্ছে না, তিনি হলেন যোগীশ্বর, সাক্ষাৎ ভগবান, আকাশতত্ত্ব তাঁর করায়ত্ত্ব, তিনি ইচ্ছে করলেই নিজেকে অন্তর্ধান করে দিতে পারেন। এতক্ষণ যার জন্য গোপীরা অহঙ্কার করছিল আমার মত জগতে কেউ সৌভাগ্যবতী নেই, সেই শ্রীকৃষ্ণই এখন উধাও হয়ে গেছেন। সেইজন্য ঠাকুর কথামৃতে বহুবার বলছেন, ঈশ্বর সব কিছু ক্ষমা করেন কিন্তু অহঙ্কারকে তিনি সহ্য করেন না। অহঙ্কার হল শেষ চৌকাঠ। দ্বিতীয় কথা হল, সাধনার সময় অনেকে মনে করেন আমি অনেকটা এগিয়ে গেছি, বাকিরা আমার থেকে পিছিয়ে আছে। কিন্তু কে কখন হুস্ করে এগিয়ে যাবে কে কখন পিছিয়ে যাবে বোঝা খুব মুশকিল, সব তাঁর হাতে। এগুলো হল আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা, তাই এগুলোকে জাগতিক ভাব নিয়ে প্রেমকথা রূপে বিচার করতে গেলে খুব সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ধর্মের কিছু কিছু গুহ্যাতি গুহ্য কথা সর্ব সাধারণের কাছে বলতে নেই। রাসলীলার বর্ণনা সবার জন্য নয়। এই গুহ্যের ব্যাপার সব ধর্মেই আছে। সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এমন কিছু গুহ্যাতি গুহ্য কথা আছে যা গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়, অন্য কাউকে বলা হয় না, এটাকে বলা হয় সিলসিলা। রাসলীলাতে গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের সাথে ক্রীড়া করছিলেন তখন তাঁদের স্থূল শরীর ছিল না, কারণ শরীরে এই রাসলীলা হয়েছিল। তৃতীয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, ঠাকুর যেমন ভাবমুখে থাকতেন, একদিকে আধ্যাত্মিক সত্তাকে দেখছেন অন্য দিকে জগতের স্থূল রূপটাকেও দেখছেন। এমনি সাধারণ অবস্থায় এই দুটোকে কখন মেলানো যায় না, অথচ ঠাকুর এই দুটো অবস্থাতেই ছিলেন। এই অবস্থাকে ঠাকুরের পরিভাষায় বলা যায় 'ভাবমুখে থাকা'। রাসলীলার বর্ণনাতে ঠিক একই কথা বলা হয়েছে। একদিকে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা রূপে দেখছেন, তিনি ছাড়া কিছু নেই এবং এই রূপে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিও করছেন। অন্য দিকে গোপীদের অন্তরের চাহিদার পূরণ হচ্ছে জাগতিক রূপে। ঠাকুরের ভাবমুখে থাকাটা যেমন স্থায়ী রূপে অবস্থান ছিল, এখানে গোপীদের ক্ষেত্রে এই ভাবমুখে থাকাটাই ক্ষণিকের জন্য। গোপীদের মনে যে সামান্য জাগতিক ভাব ছিল, কাম, ক্রোধাদি, সেটা তিনিই সরিয়ে দিয়েছিলেন। সন্তান যদি কাদা মেখে আসে তার মা'ই তার কাদা মাটি পরিষ্কার করে তাকে কোলে তুলে নেয়। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের ক্ষেত্রে ঠিক এটাই করছেন।

আধ্যাত্মিকতার উচ্চ অবস্থায় অবস্থানের নিরিখে আমরা যতটুকু জানি গোপীরা ঠাকুরের মত উচ্চ অবস্থায় ছিলেন না, যদিও বিভিন্ন জায়গাতে কবিরা গোপীদের বলছেন বেদের ঋচারাই গোপীদেহ ধারণ করেছেন। আবার কোথাও বলা হয়ে থাকে বড় বড় ঋষি যাঁরা জ্ঞানমার্গে সাধনা করেছেন তাঁরাই ভগবানের ভক্তিরস আস্বাদনের জন্য গোপীদের শরীর

ধারণ করেছেন। কিন্তু গোপীদের নিয়ে এত কথা বলা হলেও রাসলীলাতে আমরা যে বর্ণনা পাই তাতে এটা মনে হয় না যে গোপীরা সত্যিকারের সেই উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন। এখানে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি বলার পর একটা যে জাগতিক ভাবকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হল মদ। শ্রীকৃষ্ণের সাথে নৃত্যাদি করার পর গোপীদের মধ্যে এই মদ ভাব এসে যাচ্ছে। এখানে শুকদেব বলছেন *এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ। আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহভ্যধিকং ভুবি।*।১০/২৯/৪৭। গোপীরা নিজেদের কি ভাবছেন? *আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং*, জগতে এমন কোন নারী নেই যে সে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ। গোপীদের মধ্যে যে এই অহঙ্কারের উদয় হয়েছে, এটাকে আলোচনা করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন *...স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা*, আত্মজ্ঞানের পথে এগিয়ে গিয়ে যখন আত্মজ্ঞান লাভ করেন তখন তাঁর খুব আনন্দ হয়। মানুষ যখন নিজের মনের আকাঙ্খিত বস্তুকে পেয়ে আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করে ঠিক তেমনি আত্মজ্ঞানীর সেই আনন্দটা হয়। যে জিনিষটাকে পাওয়ার জন্য জন্মের পর জন্ম নিজেকে যে এই কঠিন ও দুর্গম আধ্যাত্মিক পথে নামিয়ে দিয়েছেন, সেই তত্ত্বটাকে তাঁরা পেয়ে গেছেন। এটাকে যমরাজ বলছেন *স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা*, মোদনীয়ং যেটা অর্থাৎ অত্যন্ত আনন্দের বস্তুটাকে পেয়ে গেলে তাঁর কি আনন্দই না হবে। ছোট শিশু মায়ের জন্য কাঁদছে, এখন মা এসে শিশুর সামনে হাজির হয়ে গেছে, তখন শিশুর কি আনন্দ। এখানেও গোপীদের ঠিক এই একই ভাব। তাঁদেরও ইচ্ছা ছিল যে শ্রীকৃষ্ণ একদিন তাঁদের সাথে লীলা খেলা করবেন। সেই ইচ্ছাটা এখন পূর্ণ হতে চলেছে তাই গোপীদের সাংঘাতিক আনন্দ। তাঁদের আনন্দের আর শেষ নেই। কিন্তু এই আনন্দের আকরের মধ্যেও কোথাও যেন কিছু একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছিল। যদিও এটা ভাষ্যকাররা বলছেন না। তার ফলে তাঁদের মনে ঐ অহঙ্কারটা আসছে, জগতে কোন স্ত্রী নেই যে আমার মত সুখী। মনের মধ্যে যেমনি অহঙ্কার এসেছে তখন কি হল? *তাসাং তৎ সৌভগমদং*, সৌভাগ্য হল সুহাগের প্রতীক, সৌভাগ্য শব্দটা এসেছে সুহাগ থেকে। স্বামী যত দিন বেঁচে থাকে তত দিন স্ত্রীকে বলা হয় সৌভাগ্যবতী। ভগবান যখন দেখলেন নিজেদের *সৌভগমদং*, সৌভাগ্যে তাঁদের মদং মানে অহঙ্কার এসে গেছে। সাধারণতঃ মেয়েদের যত অহঙ্কার তার স্বামীকে নিয়ে।

নদীয়াতে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর নাম ছিল রামনাথ। গ্রামের বাইরে তিনি একটা কুঁড়ে ঘরে থাকতেন। গ্রাম থেকে কিছু চাল জোগাড় করে ভাত রাঁধতেন আর তেঁতুল পাতার ঝোল করে নিজেও খেতেন আর স্ত্রীকেও তাই খাওয়াতেন, আর যত ছাত্ররা তার কাছে অধ্যয়ণ করত তাদেরও খাওয়াতেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় বুনো রামনাথ। কোন কিছুতেই তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না, কিন্তু নদীয়ার সবাই বুনো রামনাথকে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে সম্মান করত। ব্রাহ্মণ এত গরীব ছিল যে স্ত্রী সব সময় তাপ্পি দেওয়া শাড়ি পড়তেন আর হাতে একটা লাল সুতো বাঁধতেন, মানে শাঁখা বা চুরি কেনারও পয়সা ছিল না। লাল সুতো বাঁধা মানে সৌভাগ্যের লক্ষণ। গঙ্গায় ব্রাহ্মণের স্ত্রী একদিন স্নান করছেন। নদীয়ার রাজা যিনি ছিলেন তাঁর রানীও তখন পাশেই স্নান করছিল। জলে ছপাৎ ছপাৎ করে নামতে গিয়ে রানীর গায়ে জলের ছিটে গেছে। রানী তখন বলছে 'হাতে লালসুতো তাতে আবার এত অহঙ্কার'! মানে তোমার চুরি কেনারও পয়সা নেই তাতেই এত অহঙ্কার। ব্রাহ্মণী তখন বলছেন 'আমার হাতে লালসুতো আছে বলে নদীয়ায় আমার সম্মান আছে'। রানী ঐ কথা শুনে খুব অপমানিত বোধ করে রাজাকে গিয়ে নালিশ করেছে। রাজা শুনে খোঁজ নিয়ে জানলেন এ হল বুনো রামনাথের স্ত্রী। কিন্তু এত বড় কথা বলল কিসের জোরে? রাজা ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণের কাছে গেছেন। রাজা গিয়ে আলাপ করে বুঝতে পারল ব্রাহ্মণ সত্যিই একজন বড় পণ্ডিত। এই পণ্ডিতের জন্যই নদীয়ার এত সম্মান। আরও সব খোঁজ নেওয়ার পর রাজা যেভাবেই হোক ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্যে আর এই সহজ সরল জীবনধারায় খুব প্রভাবিত হয়ে পণ্ডিতকে বলছেন 'আপনার যদি কোন কিছুর প্রয়োজন থাকে আমাকে বলতে পারেন'। ব্রাহ্মণ বলছেন 'না না, আমার কিছু লাগবে না। গ্রাম থেকে আমার স্ত্রী চাল-টাল যা পায় নিয়ে আসে আর এই তেঁতুল গাছ যত দিন আছে আমার কোন চিন্তা নেই। তেঁতুল পাতার ঝোল হয়ে যায় আর ভাতও হয়ে যায়, ব্যস্ এতেই আমার সব কিছু মিটে যায়'। রাজা শুনে হতবম্ব হয়ে গেছেন 'কিছু একটা আপনি নিন'। পণ্ডিত এখনও জানে না যে তিনি নদীয়ার রাজার সাথে কথা বলছেন। তখন পণ্ডিত অনেক ভেবে চিন্তে বলছেন 'আমি যা চাইব আপনি দিতে পারবেন'? রাজা সঙ্গে সঙ্গে বলছেন 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি একবার বলে দেখুন না, আমি দিতে পারি কিনা'। তখন পণ্ডিত বলছেন 'ব্যাকারণে একটা সূত্র আছে যার অর্থ আমি কিছুতেই উদ্ধার করতে পারছি না। আপনি এই সূত্রটার অর্থ উদ্ধার করার ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারেন'? রাজা পণ্ডিতের কথা শুনে মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম করে বলছেন 'এই ব্রাহ্মণের স্ত্রীর হাতে লালসুতো বাঁধা আছে তাই নদীয়ায় তাঁর এত সম্মান'। অভাবগ্রস্ত পণ্ডিত সেইজন্যই সম্মান। ভারতের যা কিছু সম্মান এই অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণদের জন্যই হয়েছিল। এই যে পাণ্ডিত্য, শুধু পাণ্ডিত্যই নয় কারণ পাণ্ডিত্য তো যে কোন লোকই অর্জন করে নিতে পারে, কিন্তু এই পাণ্ডিত্যের সাথে যে এই ত্যাগ, এই কৃচ্ছ সাধন আর

কোথাও পাওয়া যাবে না, যেটা ভারতের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছিল। আর এটা নিয়ে ব্রাহ্মণীদের অহঙ্কার ছিল, আমার স্বামী কত বড় পণ্ডিত।

এখানেও গোপীদের ঠিক তাই হয়েছে। কিন্তু কেশব বুঝে গেছেন। তিনি কি করলেন? *প্রশমায় প্রসাদায়*, মনটাকে শান্ত করে নিলেন আর *প্রসাদায়* চিত্তশুদ্ধি না হলে প্রসাদ হয় না, গীতাতে ভগবান বলছেন *প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে*, চিত্ত প্রসাদ না হলে জীবনে শান্তি হয় না। প্রসাদ হল, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ইত্যাদি ষড়রিপুর যখন প্রশমন করে দেওয়া হয় তখন প্রসাদ আসে। গোপীদের আবরণগুলিকে একটা একটা করে শ্রীকৃষ্ণ সরাচ্ছেন। চীরহরণে গোপীদের লজ্জা নিবারণ করে দিয়েছেন। রাসলীলার দিন যখন গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বণী শুনে ব্রজ থেকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে চলে এসেছেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'তোমরা এইভাবে চলে এলে? তোমাদের স্ত্রীদের স্বধর্ম ছেড়ে কেন এভাবে শ্বাপদাকীর্ণ বনে চলে এলে'? গোপীরা তখন বললেন তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। এখানে ভগবান গোপীদের আত্মসমর্পণ করালেন। আত্মসমর্পণের পরেই আসে সমর্পণের অহঙ্কার। সমর্পণের পর শ্রীকৃষ্ণের সোহাগ পেয়ে যেতেই গোপীদের অহঙ্কারকে আর কে সামলাবে! ভগবান দেখলেন এই অহঙ্কার নিয়ে তো এগোন যাবে না। তাই তিনি কি করলেন? *তত্রৈবান্তরধীয়ত*, হঠাৎ করে গোপীদের মাঝখান থেকে তিনি নিজেকে অন্তর্ধান করে দিলেন।

এই জায়গাতে এসে ব্যাসদের তাঁর কাব্য প্রতিভাকে উজার করে দিয়েছেন। আমরা এটা মেনেই চলছি যে ভাগবত ব্যাসদেবেরই রচনা। ব্যাসদেবের রচনা শুকদেবের মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে, যিনি জন্মসিদ্ধ ত্যাগী সন্ন্যাসী। এই জিনিষ কল্পনাই করা যায় না। ব্যাসদেব যিনি এত বড় একজন ঋষি, তাঁর সন্তান শুকদেব জন্মজাত সন্ন্যাসী, তিনি অনেকের সামনে, যেখানে সারা ভারতের বড় বড় মুনির ঋষিদের সমাগম হয়েছে, সেখানে গোপীদের রাসলীলার এই দৃশ্যের বর্ণনা করছেন। কত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব হলে এই সংযোগটা হতে পারে। মানুষ এগুলো চিন্তা করতে পারেনা। সাধারণ মানুষ দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে নর-নারীর প্রেমলীলা করছিলেন। কিন্তু তা নয়। রাসলীলা অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব।

গোপীদের যদি ঠিক ঠিক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ সমর্পণ থাকত তাহলে কিন্তু *সৌভগমদং*, সৌভাগ্যের মদ আসত না। যখন ঠিক ঠিক একাত্ম বোধ হয় তখন হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। হৃদয়ের এই পরিপূর্ণতা থেকেই অপরের প্রতি করুণার ভাব, মানে সবার প্রতি ভালোবাসা, সবাইকে সংরক্ষণ দেওয়ার ভাব আসে, সবার প্রতি মাতৃভাব এসে যায়। গোপীদের মধ্যে এই ভাবটার অভাব ছিল। এই ভাবটাকে পূর্ণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করতেই গোপীদের অন্তরের মধ্যে তীব্র ছটফটানি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু অন্য দিকে ভগবানের প্রতি ভালোবাসা কাকে বলে সেখানে গোপীদের ধারে কাছে কাউকে নিয়ে আসা যাবে না। ঠাকুরও ভক্তির তুলনা করতে গিয়ে বারে বারে গোপীদের কথা বলছেন, ভক্তি হল গোপীদের।

গোপীদের এখন কি রকম অবস্থা? *করিণ্য ইব যূথপম্*, হাতিরা দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করে। হাতি একা হয়ে যাওয়া মানে জংলী হাতি হয়ে গেল। যূথপতি, পুরুষ হাতি যদি দলের মধ্যে না থাকে মেয়ে হাতি, গজিনী তখন ছটফট করতে থাকে। গোপীদের হস্তিনীদের মত দশা হয়ে গেল। কিন্তু ঐ ছটফটানিতে ভগবানের প্রতি এখন তাদের ভেতরের যে ভাব, ভক্তি, ভালোবাসা সব বেরিয়ে আসছে। *গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈ- র্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ। আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে- স্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ।*।১০।৩০।২। বিরহজ্বালায় গোপাঙ্গনরা দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, এই ছটফটানির ফলে তাঁদের অনেকগুলো ভাব প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। ক্রৌঞ্চ মিথুনের সময় বাল্মীকি যখন দেখলেন ব্যাধের তীরে পুরুষ ক্রৌঞ্চ নিহত হয়ে গেছে তখনই তাঁর অন্তঃস্থল থেকে একটা তীব্র পীড়া বেরিয়ে এল। সেই পীড়া থেকেই একটা কবিতা বেরিয়ে এল। সেখান থেকেই কাব্যের জন্ম। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীদের এখন পীড়া হয়েছে। এই পীড়াতে তাদের ভেতর থেকে অনেক নতুন রকমের ভাব বেরিয়ে আসছে, যেটা কল্পনা করা যায় না। জগত যখন প্রচণ্ড ধাক্কা আর আঘাত দিয়ে যতক্ষণ একেবারে নাড়িয়ে না দিচ্ছে ততক্ষণ ভেতর থেকে আধ্যাত্মিক ভাব আসবে না। মানুষ যখন জীবনে আঘাতে জর্জরিত হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তখনই তার ভেতরের ভাবগুলো বেরিয়ে আসে। বাল্মীকি যখন পাখীর মৃত্যুতে যে তীব্র ব্যাথা অনুভব করছেন তখন তাঁর ভেতরে যে কাব্য ছিল সেটা বেরিয়ে এসেছে। যার ভেতরে যা ভাব আছে ঐ অবস্থায় সেই ভাবটা বেরিয়ে আসবে। যার ভেতরে আধ্যাত্মিক ভাবে আছে সে আধ্যাত্মিক পথে চলে যাবে। এখানে গোপীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভাব ছিল। ছোটবেলা থেকে কৃষ্ণকে দেখে দেখে কৃষ্ণের ভাবে রঞ্জিত হয়ে গেছে। এই বিরহ জ্বালায় তাদের তাই কৃষ্ণের ভাবটাই বেরিয়ে এসেছে।

শ্রীকৃষ্ণভাবে আবেশে তারা শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে চলতেন সেই ভাবে চলছেন। শ্রীকৃষ্ণের চলন ছিল হাতির মত। হাতি একটু দুল্‌কি চালে চলে, ডান দিক বাম দিক একটু দুলে দুলে চলে। মেয়েদেরও বলা হয় গজগামিনী। গজগামিনী হল শ্রেষ্ঠ চলন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের যা কিছু, প্রেমুমধুর হাসি, বিলাসপূর্ণ কটাক্ষপাত, তাঁর মনোমুগ্ধ বাক্যালাপ, বিভিন্ন প্রকার লীলা খেলা সব গোপীরা নকল করতে লাগলেন। তিরিশ অধ্যায়ের এই দ্বিতীয় শ্লোকটি খুব মারাত্মক শ্লোক, এই জায়গাতে এসে আসল নকল একাকার হয়ে যায়। যারা প্রকৃত প্রেমিক ভক্ত তাঁরা তাঁদের ভাবের মত আচরণ করেন, আবার তাঁদের দেখাদেখি যারা নকল ভক্ত সেগুলোকে নকল করতে শুরু করে দেয়। স্বামীজীও বৈষ্ণবদের এই ধরণের অনেক কিছুর নিন্দা করতেন। কথামৃতে পাওয়া যায়, ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পর ঠাকুরের শিষ্যরা বরানগর মঠে কেউ শুয়ে আছেন, কেউ পায়চারি করছেন। সেখানে তাঁরা ঠাকুরের নকল করছেন। তার মধ্যে একজন বলছেন ঈশ্বর দর্শন হল না গলায় ছুরি দিই। পাশ থেকে একজন বলছেন 'পাশেই রাখা আছে নিয়ে নেনা'। একজন এই মজা করা নিয়ে আপত্তি করাতে স্বামীজী বলছেন 'মজা করতে গেলে আপনাকে নিয়ে করব নাকি! মজা করতে হলে তাঁকে নিয়েই করব'। ইয়ং ছেলেমেয়েরা ফিল্ম হিরো হিরোইনদের নকল করে। আবার মথুরা বৃন্দাবনধামে সবাই শ্রীরাধা আর শ্রীকৃষ্ণকেই নকল করে। তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব আছে। কিন্তু কীর্তন ও নৃত্যাদির সময় অনেকের মধ্যে নকল ভাবগুলো চলে আসে, এগুলো খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু এখানে গোপীরা একেবারে শ্রীকৃষ্ণের ভাবেতে লীন হয়ে গেছেন। মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় যাবতীয় যা কিছু আছে সব শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে আছে।

ভাগবতের এই তিরিশ অধ্যায়ের তিন নম্বর শ্লোকের ভাবকে ঠাকুরও উল্লেখ করতেন। *গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ। অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ।।১০/৩০/৩*। গোপীদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভাব নেমে এসেছে তাঁদের শরীরের অঙ্গে, চলনে বলনে, কথাবার্তায়, হাসিতে। শ্রীকৃষ্ণের মতই পদক্ষেপ, শ্রীকৃষ্ণের মতই কথা বলা, শ্রীকৃষ্ণের মতই হাসি, চাহনি। এর ফলে মাঝখান থেকে গোপীরা নিজেদের পরিচয় ভুলে গেছে, তাঁদের আমি বোধটাই উধাও হয়ে গেছে। একটু আগেই গোপীদের মদ হয়েছিল আমার মত সৌভাগ্যবতী কেউ নেই কারণ আমি আমার প্রাণের প্রিয় কৃষ্ণকে পেয়েছি। শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের মাঝখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। কৃষ্ণ প্রেমে গোপীরা এমন ডুবে আছে আর সেই অবস্থাতেই দেখছেন কৃষ্ণ নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই অনুপস্থিতিকে সহ্য করতে না পেরে সবাই মিলে শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় ভাবগুলিকে নকল করতে শুরু করলেন। *অসাবহং ত্বিত্যবয়াস্তদাত্মিকা*, এই ভাব এমন হয়ে গেছে যে তাঁরা বলতে শুরু করেছেন আমি কৃষ্ণ হয়েছি। ঠাকুর খুব মন দিয়ে ভাগবত শুনতেন। রাসলীলার এই ভাব ঠাকুরের মধ্যে প্রবল ভাবে দেখা গেছে। গোপীদের বর্ণনা করতে গিয়ে কথামৃতে ঠাকুরও বলছেন গোপীদের শ্রীকৃষ্ণে এমন তন্ময় হয়েছিল যে তাঁরা নিজেদেরকে কৃষ্ণ মনে করত, আমি কৃষ্ণ হয়েছি। অদ্বৈত পথের যাঁরা সাধক তাঁদেরও এই ভাবটাই চলে আসে অহং ব্রহ্মাস্মি। অহং ব্রহ্মাস্মির ভাবটা চিরস্থায়ী ভাব। কিন্তু এখানে রাসলীলাতে এটা সাময়িক। সুফিদের সাধনাতেই এই ভাব পাওয়া যায়, সে আল্লা এক হয়ে গেছে। আমি আর আমার ইষ্ট এক, এই ভাবটা সাধনার খুব উচ্চতম অবস্থা। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই ভাবটা সাময়িক। কিন্তু যাঁদের জ্ঞান লাভ হয়, কঠোপিনষদে যেটা বলছেন *...স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা*, অহং ব্রহ্মাস্মি এই ভাবটা একেবারে স্থায়ী। এখান থেকে তাঁর আর কখন পতন হয় না।

এই ভাব যখন এসে গেছে তখন গোপীরা এক অপরের সাথে গলা মিলিয়ে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে শুরু করেছেন। আনন্দে অন্য জগতে সবাই বিচরণ করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা সবাই কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত। হরি রস পেয়াল পিলেরে অবধূত, হরি রসের পেয়াল পান করে সবাই মত্ত হয়ে গেছেন। মত্ত হয়ে তাঁরা কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করছেন। মনে করছেন এই কুঞ্জের আড়ালে হয়তো শ্রীকৃষ্ণ লুকিয়ে আছেন। গান করে যাচ্ছে আর কৃষ্ণকে খুঁজে যাচ্ছেন, গোপীরা জানেন কৃষ্ণ কোথাও যাবেন না, তিনি এখানেই হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছেন। এখানে ব্যাসদেব কি সুন্দর বলছেন শ্রীকৃষ্ণ তো ভগবান, ভগবান কোথায় যাবেন! তিনি তো জড়-চেতন সমস্ত পদার্থের ভেতরে ও বাহিরে আকাশের মত সর্বদা অচঞ্চল ব্যাপকরূপে অবস্থিতই আছেন। তিনি গোপীদের কাছ থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেছেন, চোখের দৃষ্টিতে নেই কিন্তু সেটা তো অহঙ্কারের আবরণ এসে গেছে বলে দেখতে পারছেন না। এটাই হল কাব্য আর ধর্মগ্রন্থের তফাৎ। এটাই যদি কোন বড় কবি বা সাহিত্যিকের রচনা হত তখন সেখানে এর বর্ণনা করতে করতে দুম্ করে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে ঢুকিয়ে দিতেন না। যাঁরাই জড়ের পূজো করেন, সৌন্দর্যের পূজো করেন তাঁরা কোন দিন আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে পারবেন না। উল্টো দিক থেকে আধ্যাত্মিক পুরুষ কখনই জড়ের পূজো করেন না, সম্মানও দেন না। হৃদয়রাম যখন ঠাকুরকে দেখাচ্ছেন 'মামা! এই হল লাটসাহেবের বাড়ি'। ঠাকুর বলছেন 'আমি দেখলাম ইটের ঢিপি'। ঋষি যখন রাসলীলার বর্ণনা করছেন তখন সব কিছুর বর্ণনাই করছেন, গোপীরা কত সুন্দর, সেই রাত কত মনোরম, তাঁদের নাচ-গান কত মধুর। কিন্তু

তারপরেই মাঝখানে ঢুকিয়ে দিলেন *পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বস্পতীন্।* এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে তার সব কিছুতে তার বাইরেও তার ভেতরেও তিনি আকাশবৎ। আকাশ মানে ঈথার পার্টিকেলস্ যেখান থেকে সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। যেমন এই বোতল, এই বোতলের ভেতরেও আকাশ বাইরেও আকাশ। আমি বলতে পারি বোতলের ভেতরে তো জল আছে। হ্যাঁ, জলটাও আকাশের পার্টিকেল দিয়েই নির্মিত। একটা ঘটিকে যদি গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হয় তখন ঘটির বাইরেও গঙ্গা জল ভেতরেও গঙ্গা জল। ঠিক তেমনি আকাশ সব কিছুকে ব্যপ্ত করে আছে। জলের একেকটি পার্টিকেলের বাইরেও আকাশ আছে আর জলের ভেতরেও আকাশ আছে। আকাশ ছাড়া কোন কিছু থাকতে পারেনা। আত্মা ঠিক সেইভাবে সব কিছুর বাইরেও আছেন ভেতরেও আছেন। আত্মা আর ভগবান এক। যা কিছু আছে সব কিছুতে তিনিই ব্যপ্ত।

ব্যাসদেব বলছেন, তিনি সব কিছুতে ব্যপ্ত, রাসলীলার ঐ জায়গাতে যত পাথরের টুকরো আছে তার মধ্যেও তিনি আছেন তার বাইরেও তিনিই আছেন, যত গাছপালা আছে তার ভেতরেও তিনি তার বাইরেও তিনি আছেন। সেখানে গোপীরা কি করছেন? *পপ্রচ্ছু*, ছোট ছোট যে গুল্ম দিয়ে কুঞ্জ আছে সেখানে গিয়ে তাদের শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞেস করছেন। এমন কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়ে আছেন যে তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন 'তোমরা আমার কৃষ্ণকে দেখেছ কোথায় গেছে?' কিন্তু তার আগে ব্যাসদেব শর্ত লাগিয়ে দিয়েছেন যিনি ভগবান, যিনি সর্বব্যাপী তিনি যাবেনটা কোথায়, তাঁর কথা কোথায় জিজ্ঞেস করছ? আমরা মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে খুঁজছি, মসজিদে গিয়ে খুঁজছি, সন্ত কবীরদাস বলছেন মোঁক কাঁহা ঢুণ্ডো ম্যায় তো তেরে পাস হুঁ, ওগো তুমি আমায় কোথায় খুঁজছ, আমি তো তোমার ভেতরে বসে আছি। ঠিক এই ভাবটা ব্যাসদেব এইখানে নিয়ে আসছেন। এরপর ব্যাসদেব পুরো কাব্য রসে নেমে যাচ্ছেন। এখানে আবার বাল্মীকির খুব প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র যা কিছু দেখছেন, হরিণকে দেখছেন, গাছ দেখছেন, পাহাড় দেখছেন সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন তোমরা কি আমার সীতাকে দেখেছ। জিজ্ঞেস করার সময় সীতার বর্ণনা করে যাচ্ছেন, আমার সীতাকে এই রকম দেখতে, এই রকম ফুলের সাজ করত ইত্যাদি। এখানেও ঠিক সেই রকমই ভাবে গোপীরা তাঁদের প্রিয়তমা কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন। *দৃষ্টে বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোষ নো মনঃ। নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ।।*১০/৩০/৫। একেকটা গাছের নাম করে বলছেন, হে বটবৃক্ষ! তোমরা কি সেই নন্দ নন্দন শ্যামসুন্দরকে দেখেছ যিনি তাঁর মিষ্টি হাসি আর দৃষ্টিপাতে আমাদের মনকে হরণ করে নিয়েছেন? গোপীদের মনের অবস্থাকে এখানে কাব্যিক শৈলীতে বর্ণনা করা হচ্ছে। এই রকম ভাবে বিস্তৃত ভাবে গোপীদের এই মনের অবস্থাকে বর্ণনা করা হয়েছে। একটা জায়গায় গাছপালাদের খুব করুণ স্বরে বলছেন 'তোমাদের জন্ম তো পরোপকারের জন্যই হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বিনা আমাদের জীবন শূন্যময়, তাঁর বিরহে আমাদের চেতনা লুপ্ত হতে বসেছে। তোমরা দয়া করে আমাদের বলে দাও, কোন্ পথে শ্রীকৃষ্ণ গেছেন, কোন্ পথে গেলে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য পাওয়া যাবে'। হিন্দীতে খুব সুন্দর একটা দোঁহা আছে তরুবর ফল নহি খাত হ্যাঁয় সরোবর পি নহি পানি। বৃক্ষ নিজের ফল কখনই খায় না আর পুকুর নিজের জল কখনই পান করে না। ঠিক তেমনি সাধু সন্ন্যাসীদের যে শরীর ধারণ শুধু অপরের সেবার জন্যই, কোন কিছুতেই নিজের কোন স্বার্থ থাকে না। গোপীরা এই কথাই বলছেন, হে বৃক্ষ তোমরা তো নিজের জন্য কিছুই কর না, যা কর অপরের জন্যই কর। তোমরা ফল দান কর, শীতল ছায়া দাও, কাঠ দাও। আমাদের জন্য একটু পরোপকার করো না, একটু বলে দাও না আমাদের প্রাণনাথ কৃষ্ণ কোন দিকে গেছেন। এই কথাগুলো বিরহের যে কি গভীর মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি, আমাদের অনুধাবন করা সত্যিই অসাধ্য। একশ কি দেড়শ বছর আগে ঠিক এই মানসিকতা নিয়ে যদি এই রাসলীলার আলোচনা আমরা করতাম, আমরা হয়তো তখন অতটা বুঝতে পারতাম না। কিন্তু ঠাকুরের আবির্ভাবের পর তাঁর সাধনার যে ইতিহাস এখন আমাদের কাছে এসেছে, সেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তিনিও ঠিক এই ভাবেরই পথিক ছিলেন, ঠাকুরের জীবনে গোপীদের এই ভাবই পুনারাভিনীত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরবর্তি কালে আগত ভক্তদের কাছে তিনি তাঁর সাধনজীবনের কথা বলছেন, যেটা কথামৃতের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, সেখানে যখন তিনি গোপীদের প্রসঙ্গে কিছু বলছেন তখন তিনি ভাবে বিহ্বল হয়ে যেতেন, অশ্রুধারায় তাঁর বক্ষ সিক্ত হয়ে যেত, এতই উচ্চ ভাব। যারা ঈশ্বরের জন্য দু ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি, তাদেরকে ঈশ্বর বিরহে হৃদয়ের জ্বালা বোঝান অসম্ভব। খ্রীশ্চান পরম্পরাতে Dark night of the soul নামে একটা অবস্থার কথা বলা হয়, ঈশ্বর দর্শনের আগে সাধকের মনে হয় ঈশ্বর যেন তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। তখন যে ছটফটানিটা হয় ঠিক সেই অবস্থার কথা কবি এখানে নিজের মত বর্ণনা করছেন।

সেই রকমই একটা বর্ণনা করছে *পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ নূনং তৎ করজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎ পুলকানাহো।।*১০/৩০/১৩। *পৃচ্ছতেমা লতা বাহূ*, এই লতাগুলো বৃক্ষের শাখা বাহুগুলিকে নিজের পতিস্বরূপ ভেবে ভুজপাশে

জড়িয়ে আছে। কিন্তু লতাদের যে আনন্দ হচ্ছে সেটা বৃক্ষদের জড়িয়ে রাখার জন্য হচ্ছে না, শ্রীকৃষ্ণ নখ দিয়ে এই লতাদের স্পর্শ করেছিলেন, সেইজন্য এদের এই রোমাঞ্চ হচ্ছে। এখানে অর্থ হল, যাজ্ঞবল্ক নিজের স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলছেন মানুষ যখন কোন কিছুকে ভালোবাসে তখন সেই বস্তুর জন্য তাকে ভালোবাসে না, সেই বস্তুর মধ্যে আত্মদর্শন করে সেইজন্য ভালোবাসে। ঠিক তেমনি আমরা যে আনন্দ পাই সেই আনন্দ কখন বস্তু দিয়ে আসে না, তার মধ্যে দিব্য ভাব না থাকলে সেই আনন্দ আসে না। বেলুড় মঠে খিচুরি প্রসাদ খেয়ে যে আনন্দ হয় সেটা খিচুরির জন্য হচ্ছে না, ওতে ভগবানের দিব্য স্পর্শ আছে বলেই ঐ আনন্দটা অনুভব হচ্ছে। যে জায়গাতে আধ্যাত্মিক ভাব জড়িয়ে নেই সেই জায়গাতে সে সব সময় যে আনন্দটা পায় সেই আনন্দটা সীমাবদ্ধ থাকে, ঐ সীমাটাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনা। সেই কথাটাই আমাদের ব্যাসদেব বলছেন, মানুষের কথা তো অনেক দূরে এমন কি লতা গুল্মাদিরও যে আনন্দ হচ্ছে সেটা তার প্রিয়তম যে বৃক্ষ তাকে যে জড়িয়ে রয়েছে বলে পাচ্ছে তা নয়। আধ্যাত্মিক ব্যাপারটা এখানে রয়েছে কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাকে স্পর্শ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ওখানে গরু চড়াতেন, গোপ বালকদের সাথে খেলাধূলা করতে গিয়ে কখন সখন তাদের স্পর্শ করেছেন বা সেই রাত্রিতেই তিনি এদের স্পর্শ করে থাকতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে নিয়মিত আসতেন।

গোপীরা এইভাবে পরস্পর নানা রকমের কথাবার্তা বলতে বলতে, শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে গিয়ে এদের ভাবটা আর গাঢ় হয়ে উঠেছে। একেই তারা প্রথম দিন থেকে শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসত, সেই ভালোবাসার ধনকে আজ অন্তরঙ্গ ভাবে কাছে পেয়েছেন, কিন্তু মাঝখান থেকে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে গেলেন উধাও। প্রথমে তো তারা শ্রীকৃষ্ণের চলন, হাসি, কথাবলা নকল করতে থাকল। এগুলো করতে গিয়ে তাদের ছটফটানিটা আরও বেড়ে গেছে। এবারে এই ছটফটানির দাপটে সবাই শ্রীকৃষ্ণ ছোটবেলা থেকে যত লীলা করেছিলেন, তারা এখন এক অপরের সাথে সেই লীলাগুলো অভিনয় করতে শুরু করেছেন। যেমন একজন পূতনা হয়ে গেছেন, আরেকজন কৃষ্ণ হয়ে তার বুকে মুখ রেখে যেন তাকে বধ করতে যাচ্ছেন। *কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন। বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম্।।*১০/৩০/১৭। কেউবা বলরাম হয়ে গেছেন, কেউবা গোপগোপী হয়ে গেছেন, আবার কেউবা বকাসুর, কেউবা বৎসাসুর হয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলার অভিনয় করছেন। ছৌ নাচে ধর্মীয় কাহিনী নিয়ে করা হলেও তার মধ্যে ঐ আধ্যাত্মিক ভাব থাকে না, কিন্তু এখানে সবাই সত্যিকারের ঐ ভাব নিয়ে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে যে ভাবে সবাইকে আশ্বাস দিয়েছিলেন ঠিক সেইভাবে ব্রজগোপীগণ বলছে 'হে ব্রজবাসী! তোমরা ভয় পেও না। এই ঝঞ্ঝা থেকে বাঁচানর পথ আমি পেয়ে গেছি'।

এইভাবে অভিনয় করতে করতে এগিয়ে যেতে গোপীরা হঠাৎ পূর্ণিমার স্নিগ্ধ মনোরম আলোতে মাটির ধূলি পথে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখতে পেলেন। ঐ আলোতেও তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন পদচিহ্নে ধ্বজা, পদ্ম, চক্র, বজ্র, অঙ্কুশ, যব ইত্যাদির চিহ্ন পায়ের ছাপে রয়েছে। তার মানে শ্রীকৃষ্ণ এই দিক দিয়েই গেছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র ভারতে দুই রকমের, একটাকে বলা হয় জ্যোতিষ বিদ্যা আরেকটিকে বলা হয় সামুদ্রিক বিদ্যা। হস্তরেখা বিচার করাটা সামুদ্রিক বিদ্যা। আমাদের পরম্পরাতে পণ্ডিতরা সামুদ্রিক বিদ্যাকে কোন গুরুত্ব দেন না। সামুদ্রিক বিদ্যা ভারতে পাশ্চাত্য জগৎ থেকে এসেছে। কিরো নামে একজন পাশ্চাত্য জ্যোতিষি ছিলেন, তিনিই এই বিদ্যাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু এখানে যেটা বলা হচ্ছে এটাই ঠিক ঠিক জ্যোতিষ শাস্ত্র। ভারতে জ্যোতিষ শাস্ত্রে কখন হাতের রেখা দিয়ে বিচার করা হয় না। হাতের রেখা বিচার করা হল সামুদ্রিক বিদ্যা ভারতের পণ্ডিতরা এটাকে অনুসরণ করতেন না। কিন্তু মাঝখান থেকে পাশ্চাত্য দেশ থেকে সামুদ্রিক বিদ্যা আর ভারতের জ্যোতিষ বিদ্যা এই দুটোকে মিলিয়ে জগাখিচুরি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ বিদ্যা, সামুদ্রিক বিদ্যা আর জ্যোতিষ বিদ্যা এই তিনটেই পুরো আলাদা বিদ্যা। ভারতের ঠিক ঠিক জ্যোতিষ বিদ্যা হল এই চিহ্নগুলিকে বিচার করা। নবজাতক শিশুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে কি কি চিহ্ন আছে তাই দেখে তার সব কিছু বিচার করাটাই ভারতের প্রাচীন জ্যোতিষ বিদ্যার অন্তর্গত। যেমন শরীরের বিভিন্ন জায়গায় তিল থাকলে বিভিন্ন অর্থ হয়। যারা রাজপুরুষ হন তাঁদের পায়ের নীচে কিছু কিছু চিহ্ন থাকে, হাতেও কিছু কিছু চিহ্ন থাকে। জ্যোতিষ পণ্ডিতদের মত ছিল যিনি অবতার হন তাঁর পায়ে এই চিহ্নগুলো থাকবে, যেটা এখানে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের ছাপে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বার্মাতে যখন বৃটিশ সৈন্যরা যুদ্ধ করতে এসেছিল জিম করবেট তাদের ট্রেনিং দিয়েছিলেন। পায়ের ছাপ দেখে বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করার বিদ্যাটা জিম করবেট খুব ভালো জানতেন। জিম করবেট দেখাচ্ছেন, একটা রাস্তা, সেই রাস্তাটাকে অবশ্যই ধুলো রাস্তা হতে হবে। ধুলোর উপর পায়ের ছাপ দেখে বলতে হবে কত জন সৈন্য এই রাস্তা দিয়ে গেছে। এতে শত্রুর পক্ষের কত সৈন্যবল সেটা বলে দেওয়া যাবে। তারা দৌড়ে দৌড়ে গেছে, না মার্চ করতে করতে গেছে সেটাও বলে দেওয়া যাবে। তারা কত ওজনের মালপত্র নিয়ে গেছে, কত লোক আছে সব হিসাব একেবারে পরিষ্কার করে বলে দিতেন। এগুলো পড়ে সত্যিই খুব অবাক লাগে। এর ব্যাখ্যাটা জিম করবেট অনেক পরে দিয়েছেন। বার্মার যুদ্ধে এই

বিদ্যাটা খুবই কাজে লেগেছিল। এখানেও ভগবানের পায়ের ছাপের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এই চিহ্নের ব্যাপারটা এটাই হল ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র।

গোপীরা তো প্রথমে দেখে বললেন এটা তো শ্রীকৃষ্ণের পায়ের ছাপ। তারপরেই বলছেন এখানে তো মেয়ের পায়ের ছাপও আছে। কে সেই নারী যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গেছে। *অনয়াহহরাধিতো নূনং ভগবন্ হরিরীশ্বরঃ। যান্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ।*।১০/৩০/২৮। শ্রীকৃষ্ণ যাঁকে নিয়ে গেছেন ইনি অবশ্যই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা। এখানেও গোপীরা একক্ষণের জন্যও ভুলে যাচ্ছেন না যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। ভগবান আমাদের ছেড়ে দিয়ে একজনকে যখন নিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই উনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ আরাধিকা। কিন্তু এখানে শ্লোকে বলা হচ্ছে *অনয়াহহরাধিতো*, কৃষ্ণ যাকে খুব ভালোবাসেন। *অনয়াহহরাধিতো* কে দুভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়, কৃষ্ণ যাঁকে খুব ভালোবাসেন বা যিনি কৃষ্ণকে খুব ভালোবাসেন। তখন একজন বলছেন শ্রীকৃষ্ণ তো ভগবান, তিনি সব পাপ হরণ করেন আর ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মীদেবী এনারাও শ্রীকৃষ্ণের পায়ের রজ অঙ্গে লাগান, আমিও তাই এই পায়ের রজ লাগাবো। এই বলে সেই গোপী পায়ের ছাপের ধুলো মাথায় ধারণ করছেন। অন্য একজন বলছেন যাই বলো ভাই, এই কৃষ্ণের পায়ের ছাপের পাশে অন্য এক নারীর পায়ের ছাপ দেখে আমার হৃদয়ে বড় জ্বালা অনুভব হচ্ছে। চল আমরা একটু খোঁজ করে দেখি কে সেই ভাগ্যবতী ললনা।

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন – গোপীরা যখন এগিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁরা অনেক রকম চিহ্ন দেখছেন। একটা জায়গায় এসে একজন গোপী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন 'এই দেখো দেখো, এই জায়গাতে কৃষ্ণের পায়ের ছাপের মাটিটা ধসে গেছে। তার মানে নিশ্চয়ই যে মেয়েটি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আছেন তাঁকে তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণের ওজন বেড়ে গেছে বলে এখানকার মাটিটা ধসে বসে গেছে'। এই কথাটা জিম করবেটও বলেছেন। আর এইখানে পায়ের ছাপের সামনের দিকের মাটিটা বেশী ধসে আছে। তার মানে এখানে যে ফুলের গাছ আছে, নিশ্চয়ই সেই মেয়েটির জন্য কৃষ্ণ পায়ের সামনের দিকটা চেপে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ফুল পাড়ছিলেন। এই দেখো পায়ের ছাপটা কেমন পাল্টে গেছে। ব্যাসদেবের কি গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল এখানে সেটা খুব সুন্দর বোঝা যায়। ব্যাসদেব এইভাবে বর্ণনা করে বলছেন *রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোহপ্যখণ্ডিতঃ। কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাম্।*।১০/৩০/৩৫। এই শ্লোকে ব্যাসদেব আবার আধ্যাত্মিক ভাবকে নিয়ে আসছেন। পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলছেন 'পরীক্ষিৎ! যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি আত্মারাম, আত্মারাম মানে যিনি নিজের আত্মাতেই আনন্দে থাকেন, তাঁর কিছুই প্রয়োজন হয় না। তিনি কেন কোন মেয়েকে ভালোবাসতে যাবেন। অপূর্ণতার ভাব যার মধ্যে আছে তবেই সে কাউকে ভালোবাসতে যাবে। আপ্তকামস্য কা স্পৃহা, যাঁর সব কামনা বাসনা পূর্ণ হয়ে আছে, তাঁর কিসের জন্য স্পৃহা হবে!

একজন লেখক বর্ণনা দিচ্ছেন ইস্তাম্বুল শহরে তুষারপাত হচ্ছে। একজন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখে বন্ধু বাড়িতে নেই। লেখক সেখানে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন A man leaves his home he must be a very unhappy person, বাড়ি ছেড়ে কে চলে যায়? যে অখুশী। আমার বর্তমান অবস্থায় যদি খুশী না থাকি তবেই তো আমি বাড়ি ছাড়ব। এই মুহূর্তে আমরা এখানে সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। কারণ আমরা অখুশী, অখুশী বলেই বাড়ি ছেড়ে এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে এসেছি। আমরা জানি এই শাস্ত্র পড়াতে আনন্দ অনেক বেশী যেটা আমি বাড়িতে বসে পাবো না। স্ত্রী কেন বাপের বাড়িতে যেতে চায়? কারণ শ্বশুড় বাড়িতে সে অখুশী। আর বিয়ে কেন করে? বাপের বাড়িতে অখুশীতে আছি। মানুষ তখনই তার বাড়ি ছাড়ে যখন সে খুশী থাকে না। আর যখন মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ছে আর সেই সময় যদি কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় তখন বুঝতে হবে সে খুবই অখুশী। কোন সন্ন্যাসীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনার বাড়ি কোথায় ছিল? সন্ন্যাসী তখন এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবে। বাড়ি এমনই দুঃখদায়ক ছিল যে সন্ন্যাসী সেটাকে চিরদিনের মত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। যে জিনিষটাকে চিরতরে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন তার কোন কথা সন্ন্যাসী মনে রাখবেন আর অপরকে বলতে যাবেন! বাড়িটা যদি সুখদায়ক হত তাহলে সন্ন্যাসী ওখানেই থাকতেন। মানুষ অখুশী না হলে বাড়ি ছাড়ে না। সন্ন্যাসীরা এমনই অখুশী যে তাঁরা চিরতরের মত বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন। কিন্তু ভগবান হলেন আত্মারাম, তাঁর অখুশী হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। তাই তিনি যাবেনটা কোথায়? ভগবান পূর্ণ আত্মারাম, তিনি আবার একটা মেয়েকে কাঁধে তুলে ফুল পাড়বেন, এটা কখন হতে পারে! তাহলে তিনি কিসের জন্য এগুলো করলেন? এই যে এখানে বলছেন *অনয়াহহরাধিতো নূনং*, দুটো অর্থেই হতে পারে, মেয়েটি শ্রীকৃষ্ণকে খুব ভালোবাসে বা কৃষ্ণ যাকে আরাধনা করছেন, কৃষ্ণ যাকে ভালোবাসছেন। এটাই পরবর্তি কালের ভক্তি শাস্ত্রে হয়ে গেল শ্রীরাধিকা। অথচ পুরো ভাগবতে আমরা কোথাও শ্রীরাধার উল্লেখ পাইনা। শ্রীরাধা একমাত্র চরিত্র, যে চরিত্রকে সমস্ত হিন্দুরা পূজো করছে কিন্তু হিন্দু ধর্মের মূল শাস্ত্র গ্রন্থে কোথাও শ্রীরাধার অস্তিত্বই নেই। সেইজন্য জগন্নাথ ধামে শ্রীরাধা নেই। দ্বারকাতেও রাধা অনুপস্থিত। রাধা হলেন মথুরা বৃন্দাবনের।

কিন্তু ভারতের জনমানসের মধ্যে রাধা এখন এমন গভীর ভাবে ঢুকে গেছে যে, কৃষ্ণের নামের সাথে একসাথে রাধার নাম উচ্চারণ হয়, কোথাও রাধাকৃষ্ণ, কোথাও রাধাগোবিন্দ ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ হলেন পূর্ণকাম, কিন্তু তিনি ওই রকম করতে গেলেন কেন? তখন এই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে বলছেন *কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাম্।* যারা কামী পুরুষ তারা কিভাবে নারীদের জন্য নিজেদের দীনতার মত আচরণ করে এইটাকে দেখাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই ধরণের ব্যবহার করছেন। এই দেখো কামী পুরুষরা মেয়েদের সামনে কি রকম হাতজোড় করে পড়ে থাকে আর মেয়েদের কথায় ওঠবোস করে। আর তার সঙ্গে দেখাচ্ছেন মেয়েরা কি রকম কুটিল হয়, এখানে সংস্কৃতে শব্দটা হল *দুরাত্মতাম্,* এটাকে দেখানোর জন্য ভগবান এই খেলাটা রচনা করেছেন। এখানে খেলাটা দুটো অংশে হচ্ছে। প্রথম অংশে শ্রীকৃষ্ণের যিনি আরাধিতা শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিয়ে সবার মাঝখান থেকে উধাও হয়ে গেছেন। তারপর তিনি সেই আরাধিতার সঙ্গে খেলা করছেন, তাঁকে কাঁধে করে ফুল পাড়ছেন। এখানে রাধার নাম কোথাও নেই, শুধু শব্দটা আছে। আসলে ব্যাসদেব যখন এই রাসলীলা রচনা করেছেন তখন একটা বিশেষ পয়েন্টকে তুলে ধরার জন্য এই অংশটা রচনা করেছেন, যেটাকে পরের দিকের লেখক কবিরা ভক্তিশাস্ত্রে নাম দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। বাকি গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আর এদিকে শ্রীকৃষ্ণ তাদের ছেড়ে দিয়ে যাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন, এইবার তার অহঙ্কারকে আর কে সামলাবে। এর আগে বলা হয়েছিল গোপীদের অহঙ্কার, আমাদের মত সৌভাগ্যবতী এই জগতে আরে কেউ নেই। আর একটি যে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বেরিয়ে গেলেন, তার আর অহঙ্কারের শেষ নেই। সে নিজেকে মনে করছে আমি বাকি গোপীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র আমাকেই ভালোবাসেন। এই ভাবটাকে অবলম্বন করেই পরবর্তি কালে শ্রীরাধার লীলাখেলাকে ভক্তিশাস্ত্রে নিয়ে আসা হয়েছে।

ভাগবত হল একেবারে খাঁটি আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ কোন মেয়ের হাত ধরেছেন, কোন মেয়ের সাথে নৃত্য করেছেন এর বর্ণনা করা ভাগবতের কাজ নয়। ভাগবতের কাজ একটাই, মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগানো, যেখানে যেখানে দুর্বলতা আছে সেগুলোকে তুলে ধরে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রথমে কি হয়েছে? গোপীদের মদ হয়েছে, তিনি একজনকে নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। এবার এই মেয়েটি কিছুক্ষণ পর বলছে আমি আর হাঁটতে পারছি না। এখানে এর উল্লেখ নেই, এটাকে ধরে নেওয়া হয়েছে। যেতে যেতে ফুলের বাহার দেখে বলছে 'এই ফুলগুলো কি সুন্দর দেখতে'। তিনি আবার তাঁকে ফুল পেড়ে দিচ্ছেন। আরাধিতা যিনি, আমরা ধরে নিচ্ছি তিনিই রাধা, যদিও এখানে রাধার নাম উল্লেখ নেই। এরপর তাঁর অহঙ্কার হয়েছে আমার মত আর কোন গোপী নেই। রাধা বলছেন আমি না আর হাঁটতে পারছি না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন ঠিক আছে তুমি আমার কাঁধে এসে বস। রাধা তখন যেমনি শ্রীকৃষ্ণের পেছন থেকে কাঁধে উঠতে উদ্যোগ নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। এবার উনি পড়ে গেছেন একা। এখানে পরীক্ষিৎকে শুকদেব দেখালেন মেয়েরা কত কুটিল হতে পারে।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হলেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আর আত্মারাম। তিনি সেই গোপীকে বললেন হ্যাঁ, হ্যাঁ! তুমি আমার কাঁধে এস'। কাঁধে ওঠানোর কায়দা করে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেলেন। এই গোপী এখন অসাধরণা গোপী থেকে হয়ে গেলেন সাধরণা গোপী। সাধরণা গোপী হয়ে এখন সে ক্রন্দন করতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে অন্যান্য গোপীরা শ্রীভগবানের চরণ চিহ্ন ধরে ধরে সেখানে পৌঁছে এসে দেখলেন তাঁদেরই সখী শ্রীকৃষ্ণ বিরহের দুঃখে অচেতন হয়ে ধূলায় পড়ে আছেন। শুকদেব বলছেন, এই ঘটনটা বর্ণনা করা হয়েছে এটা দেখাবার জন্যে যারা কামী তাদের যে দীনতা ও দুর্বদ্ধিতায় কি অবস্থা হতে পারে। স্ত্রী পরবশতায় কামী পুরুষের কি করুণ অবস্থা হতে পারে সেটাও দেখান হল। নারী তার মনোহারী মিষ্টি কথা দিয়ে পুরুষদের একেবারে নাচিয়ে ছেড়ে দেয়। ঠাকুর নিজের অবস্থা বর্ণনা করে শ্রীমার নামে বলছেন 'আমি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী, আমারই মাগ বললে গিয়ে কাজ নেই তাই আমার আর যাওয়া হল না, সংসারীদের তাহলে কি অবস্থা'! ঠাকুর বলছেন – ওখানে গিয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও খাবি খাচ্ছে। তার সঙ্গে মেয়েদের কুটিলতা। *তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিং চ মাধবাৎ। অবমানং চ দৌরাত্মাদ্ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ।।*১০/৩০/৪২। সব গোপীরা মিলে সেব-শুশ্রূষা করে এর চেতনা ফিরিয়ে আনলেন। চেতনা ফিরে আসতেই বাকি গোপীরা যত কাঁদছিল এই গোপী তাদের সম্মিলিত কান্নাকে ছাড়িয়ে আরও জোরে বেশী কান্না জুড়ে দিয়েছে। কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হয়ে বলছেন যে করেই হোক আমার প্রিয়তম গোবিন্দের দেখা করিয়ে দাও। আমার নিজের নির্বুদ্ধিতার দোষেই গোবিন্দের প্রিয়-সমাদর থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি, সেই হৃদয়রাজ আমাকে ছেড়ে গেছেন। এরপর সবাই আরও এগিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু জঙ্গল এত ঘন হয়ে আসছে যে সেখানে চন্দ্রের আলোও ঢুকতে পারছে না। এই অন্ধকারে কৃষ্ণকে আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না, আর অরণ্যের যত গভীরে প্রবেশ করছে ততই অন্ধকারের ঘনত্ব বাড়তে লেগেছে।

এই অন্ধকারে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে পাওয়া যাবে না মনে করে সবাই এবার ওখান থেকে ফেরত চলে এসেছে। ফিরে ওখান থেকে তারা গৃহে ফিরে গেলেন না। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের গৃহের কথা তাঁদের মনে পড়ল না। তাঁদের মন শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কিছুই নেই। গোপীরা এখন বিরহ আবেশে গান করতে লাগলেন। ভাগবতের এই অংশের নাম গোপিকা-গীত। বিরহের গানের জন্য গোপিকা-গীত খুব বিখ্যাত। বিরহে মনের কত রকমের অভিব্যক্তি হতে পারে তারই বর্ণনা এই গোপিকা–গীতে দেখানো হয়েছে। গোপিকা-গীতের মাধ্যমে গোপরমণীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অকুল ভালোবাসা ও বিরহ বেদনা ঝরে পড়ছিল। গোপীদের এই বিরহ যন্ত্রণার আর্তি দেখে শ্রীকৃষ্ণ আবার নিজে থেকেই গোপব্রজঙ্গনাদের মাঝখানে প্রকট হলেন।

প্রশ্ন হতে পারে এত গোপী থাকতে শ্রীকৃষ্ণ একজন গোপীকেই নিয়ে গেলেন কেন। এই ব্যাপারে আমরা যেন ভাগবতকে কখনই মনে না করি এটি একটি ইতিহাস বা কাব্যগ্রন্থ। একটা আদর্শকে জনমানসের সামনে উপস্থাপিত করার জন্য ব্যাসদেব একটা কাহিনীকে সামনে নিয়ে এসেছেন। এখানে সব গোপীদের মনে অহঙ্কার হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এঁদের এই অহঙ্কারকে চূর্ণ করতে চাইছেন। কিভাবে চূর্ণ করবেন? গোপীদের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে তিনি সব গোপীদের মাঝখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। এখন কিভাবে নির্বাচিত করেছেন আর কেন ঐ একজনকেই বেছে নিলেন তার কোন বর্ণনা ব্যাসদেব দেননি। আরাধিতা শব্দটা ব্যাসদেব বলছেন না, গোপীরা বলছে। গোপীরা এক অপরকে বলছেন নিশ্চয়ই সেই গোপী শ্রীকৃষ্ণের আরাধিতা। তাই বলে তিনি কি শ্রীকৃষ্ণের আরাধিতা? আদপেই না। এটা গোপীদের নিজেদের ঈর্ষার কথা। বৈষ্ণব মতে যাই বলা হয়ে থাকুক, ভাগবত মতে এটা যুক্তিতে দাঁড়াচ্ছে না। এখানে দুটো সম্ভবনা থাকতে পারে, একটা হল ঝিকে তিরস্কার করে বউকে শিক্ষা দেওয়া। যে কোন একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে বাকিদের শিক্ষা দিয়ে দিলেন। তারপর একেও শিক্ষা দিয়ে দিলেন। যখন চিতা জ্বালান হয় তখন বাঁশ দিয়ে খুব করে খোঁচান হয়, চিতার আগুন শেষের দিকে চলে এলে ঐ বাঁশটাকেও চিতার আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। আরাধিতাকে নিয়ে সবটাকে পুড়িয়ে দিলেন তারপর তাকেও ফেলে দিলেন। এই একজনকে অবলম্বন করে সবাইকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অহঙ্কার এই জিনিষগুলো ভালোবাসায় চলে না।

তাকে সবার থেকে দেখতে সুন্দর ছিল কি ছিল না এই নিয়ে ব্যাসদেবের কোন মাথাব্যাথা নেই, কারণ সৌন্দর্যের বর্ণনা করা ব্যাসদেবের কাজ নয়। ব্যাসদেবের একটিই কাজ আধ্যাত্মিক ভাব জাগ্রত করা। কি ভাব? তুমি যদি অহঙ্কার কর তাহলে তোমার প্রিয় যিনি সেই ইষ্টও তোমার কাছে থাকলেও তোমাকে ছেড়ে চলে যাবেন। কি ভাবে দেখাচ্ছেন? গোপীদের মাঝ পথে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। শুধু ফেলে দিলে হবে না, এদের আচ্ছা করে পোড়াতে হবে। কিভাবে পোড়াতে হবে? একটিকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন। এরপর তার যে অহঙ্কার হল তখন তাকেও কাঁধে তোলার কায়দা করে উধাও হয়ে গিয়ে পোড়ালেন। অন্য গোপীদের শুধু মাত্র অহঙ্কার হয়েছিল, এই গোপী আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকেই নাচাতে চাইছিল, আমি না হাঁটতে পারছি না, আমাকে একটু কাঁধের করে নিয়ে চল না। ভাগবত হল আধ্যাত্মিক গ্রন্থ এখানে গোপীদের সৌন্দর্যের বর্ণনার কোন মূল্য নেই। আধ্যাত্মিক ভাবের মূল্যই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। সাধনার পথে বিঘ্ন স্বরূপ আমাদের ষড়রিপু গুলো কিভাবে সরানো যায় সেটাকেই আখ্যায়িকার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আখ্যায়িকা হলেও এর মধ্যে যুক্তির সামঞ্জস্য আছে। এর আগে চীরহরণ হয়ে গেছে তাও এদের কিছু রিপু প্রবল ভাবে থেকে গেছে। আত্মসমর্পণ পর্যন্ত হয়ে গেছে তাও সম্পূর্ণ নিবেদন হচ্ছে না। কারণ অহঙ্কারটা থেকে গেছে। একটার পর একটা শিক্ষা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের আবরণ গুলিকে সরিয়ে দিচ্ছেন। ভাগবতের মত গ্রন্থের এটাই বৈশিষ্ট্য যে এই গ্রন্থগুলি এমন কিছু কিছু ভাব দিয়ে দেন, পরবর্তি কালে ঐ ভাবগুলোকে আরও বিস্তার করে নতুন নতুন গ্রন্থ লেখা যায়। এই রাসলীলাকে অবলম্বন করে পরের দিকে কত গ্রন্থ রচনা হয়েছে, দুদিকেই বিস্তৃতি পেয়েছে, ভক্তিশাস্ত্রের দিকেও বিস্তার পেয়েছে আবার প্রেমশাস্ত্রের দিকেও বিস্তার লাভ করেছে।

গোপিকা-গীত হয়ে গেছে। গোপীরা আর কৃষ্ণ-বিরহের জ্বালা সহ্য করতে পারছে না। সবাই খুব ক্রন্দন করে চলেছে। ব্যাসদেব এর আগে বলেছিলেন গোপীদের সূক্ষ্ম শরীর বা কারণ শরীর নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। রাসলীলার শুরু থেকে গোপিকা-গীত পর্যন্ত দু তিন ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কোন গ্রামের বাড়ির মেয়েরা যদি বাড়ি থেকে দু তিন ঘন্টা নিরুদ্দেশ হয়ে থাকে তাহলে বাড়ির লোকরা কি চুপচাপ বসে থাকতে পারবে। তারাও বাড়ির মেয়েদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়বে। আর শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে শুধু মেয়েরাই কেন এল পুরুষরা কেন এল না। ব্যাসদেব তাই বলছেন গোপীদের স্থূল শরীর আসেনি তাঁদের সূক্ষ্ম শরীর চলে এসেছিল। গোপীরা বিরহ কাতর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভাবে, ভাষায়, ছন্দ

মাধুর্যে, ব্যঞ্জনায় গভীর ভাবে আর্তি নিবেদন করে রোদন করতে থাকলেন ঠিক সেই সময় হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মধ্যে পুনরায় আবির্ভূত হলেন। তখন মৃত মানুষে যেন প্রাণ জেগে উঠল। তারপর যা হওয়ার সেই ভালোবাসার অভিব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করতে শুরু করলেন। এই ভালোবাসার বর্ণনার মধ্যে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন *ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্যয়ম্। নোভয়ংশ্চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রুহি সাধু ভোঃ।*।১০/৩২/১৬। 'হে কৃষ্ণ! প্রেম তিন রকমের, এক ধরণের লোক যারা তাদের ভালোবাসে তাদেরকেই তারা ভালোবাসে। এরা বলে ভালোবাসা এক তরফা হয় না, তুমি আমাকে ভালোবাসবে আমিও তোমাকে ভালোবাসব। দ্বিতীয় কেউ কেউ আছে ঠিক এর বিপরীত তাদের যারা ভালোবাসে না সে তাদেরকেও ভালোবাসে। এদের মনোভাব হল তুমি আমাকে ভালোবাস আর নাই বাস আমি তোমাকে ভালোবাসি। আবার তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে যারা এই উভয়ের কাউকেই ভালোবাসে না। হে কৃষ্ণ! এই বিষয়ে ভালোমন্দ তুমি আমাদের ভালো করে বুঝিয়ে দাও'। গোপীরা সবাই মিলে কৃষ্ণকে ভালোবাসছে। এর মধ্যে একজন গোপী শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসে শ্রীকৃষ্ণও তাকে ভালোবাসে। দ্বিতীয় গোপী শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসে না কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাকে ভালোবাসেন। আর তৃতীয় হল তুমি আমাকে ভালোবাস আর নাই ভালোবাস আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারব না, আমার মধ্যে কোন ভালোবাসাই নেই। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে চাইছেন তাঁর কোনটা ভালো লাগে। আদপেই তোমার মধ্যে ভালোবাসা আছে কি নেই। যদি তোমার মধ্যে ভালোবাসা থাকে তাহলে এই ভালোবাসা তোমার কার প্রতি যারাই তোমাকে ভালোবাসে তাদের প্রতিই কি তোমার ভালোবাসা যায়, কি তারা তোমাকে ভালো না বাসলেও তোমার ভালোবাসা তাদের প্রতি যায়। ভক্তি যোগে স্বামীজী ঠিক এই প্রশ্নগুলো নিয়েই আলোচনা করেছেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ভালোবাসার জন্য ভালোবাসা এই ভালোবাসা স্বার্থের ভালোবাসা এর মধ্যে লেনদেন থাকে। ভালোবাসাতে ব্যবসা বাণিজ্য চলে না। স্বামীজী এর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, আমি হিমালয়কে ভালোবাসি কিন্তু হিমালয় সেই ভালোবাসার বিনিময়ে তাকে ফেরত কিছু দেয় না। তুমি আমাকে যদি ভালোবাস তাহলে আমিও তোমাকে ভালোবাসব এটা হল পুরোপুরি কেনাবেচার ভালোবাসা। এই ভালোবাসায় কোন সৌহার্দ্য থাকে না আর এতে কোন ধর্মও থাকে না। এটা কোন ভালোবাসাই নয়, পুরো ব্যবসা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তুমি আমাকে ভালোবাস আর নাই ভালোবাস আমি তোমাকে ভালোবেসে যাব, এই ধরণের ভালোবাসা একমাত্র করুণাশীল সজ্জনদের মধ্যেই থাকে। এখানে শ্লোকে বলছেন *ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা। ধর্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদং চ সুমধ্যমাঃ।*।১০/৩২/১৮। মা-বাবা সন্তানের প্রতি যে রকম করুণাশীল হন তাঁরাই এই ভালোবাসা বাসতে পারেন। আর স্বভাবতঃ যাঁরা সবারই প্রতি করুণাসম্পন্ন, সবারই প্রতি স্নেহ ভালোবাসা, যেমন সাধু সন্ন্যাসীরা হন। স্বামীজী সেইজন্য ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্রে বলছেন *আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ*। ঠাকুরকে আমরা ভালোবাসছি কি বাসছি না, ভজনা করছি কিনা তাতে ঠাকুরের কিছু আসে যায় না কিন্তু সবারই প্রতি চণ্ডাল পর্যন্ত তাঁর ভালোবাসা সমান ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। এই ভালোবাসা খুব কঠিন এটা সহজে হয় না। একটু আধ্যাত্মিক ভাব না থাকলে মাও নিজের সন্তানকে সহ্য করতে পারেনা। সাধারণত মা-বাবার সন্তানের প্রতি, গুরুর শিষ্যের প্রতি আর সন্ত মহাপুরুষ যাঁরা তাঁদের স্বভাবের মধ্যেই এই ধরণের করুণার ভাব থাকে। পাড়ার কিছু কিছু বিধবা মহিলাদের দেখা যায় তারা রাস্থার কুকুরকে বেড়ালকে ভালোবাসে। অনেক সময় দেখা যায় কোন বয়স্কা মহিলা রাস্থা দিয়ে গেলে পাড়ার যত কুকুর দৌড়ে এসে তার গায়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। তিনি হয়তো কুকুরকে বিস্কুট বা অন্য কিছু খাওয়ান। উনি কাউকে কিছু বকাবকি করতেন না। কুকুরগুলোও জানে আমি এখানে আশ্রয় পাই। এরাই ঠিক ঠিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। আবার কিছু লোক হয় যাদের কেউ ভালোবাসছে কিন্তু তাও সে ভালোবাসতে পারেনা, আর না ভালোবাসলে সেখানে তো ভালোবাসার কোন প্রশ্নই নেই।

ভালোবাসার ব্যাপারে মূলতঃ চার ধরনের লোক হয়ে থাকে। প্রথম আমি ভালোবাসছি আপনিও আমাকে ভালোবাসছেন। দ্বিতীয় আপনি ভালোবাসেন না তাও আমি আপনাকে ভালোবাসছি। তৃতীয় আপনি ভালোবাসছেন কিন্তু আমি আপনাকে ভালোবাসছি না। আর চতুর্থ আপনিও ভালোবাসেন না আমিও আপনাকে ভালোবাসি না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ভালোবাসাও চার রকমের হয়ে যায় – প্রথম যিনি নিজের স্বরূপে অবস্থিত। এঁদের সবারই প্রতি ভালোবাসা থাকে, এনারা অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় এনারা দ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু কৃতকৃত্য, মানে তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়ে গেছে। প্রথম জনের ক্ষেত্রে আমি তুমির ভেদটা মিটে গেছে, দ্বিতীয় জনের ক্ষেত্রে আমি তুমির ভেদটা আছে কিন্তু কৃতকৃত্য, অর্থাৎ তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়ে গেছে সেইজন্য জগতের কাছ থেকে তাঁর কোন ধরনের প্রত্যাশা নেই। তুমি ভালোবাসে বা ভালো না বাসলেও তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। তৃতীয় হল যারা জানেনা তাকে কে ভালোবাসে। চতুর্থ শ্রেণীরা হল যারা অকৃতজ্ঞ। এরা জানে সে আমাকে ভালোবাসে তবুও তার ক্ষতি করতে চায়। যিনি গুরুতুল্য ব্যক্তি এরা তারও ক্ষতি করে।

গোপীদের প্রশ্ন যেটা ছিল সেই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ নিজের ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন। যারা আমাকে ভালোবাসে তাদেরকেও আমি সেইভাবে ভালোবাসি না। কেন ভালোবাসি না? যাতে তাদের চিত্তবৃত্তিটা আমার উপর লেগে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের ভালোবাসাটা জাগতিক ভালোবাসা নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যেমন কোন নির্ধন গরীবলোক হঠাৎ প্রচুর অর্থ বা সম্পত্তি পেয়ে যায় তাতে তার খুব আনন্দ হয়। এইবার তার ঐ টাকা বা সম্পত্তি যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন তার মনটা ঐ টাকাতেই পড়ে থাকে। ঠিক তেমনি যখন আমি কারুর উপর কৃপা করে তার সামনে চলে আসি তার খুব আনন্দ হয়। আর আমি যখন তার কাছ থেকে সরে আসি তখন তার মনটা পুরো আমার উপর পড়ে থাকে। আমি চাই এদের মন যেন সব সময় আমাতেই পড়ে থাকে। সেইজন্য আমি তোমাদের সাথে লীলা করছি আবার তোমাদের কাছ থেকে অন্তর্ধান হয়ে যাচ্ছি, যাতে তোমাদের মন প্রাণ আমার উপরই লেগে থাকে। বাইবেলে একটা গল্প আছে যাতে এক ভদ্রলোকের দুই ছেলে। ছোট ছেলে ঝগড়া করে বলল আমার হিস্যে আমাকে দিয়ে দাও। সেই টাকা নিয়ে ছোট ছেলে চলে গেল ব্যবসা করতে। অনেক বছর ব্যবসা করে তার সব টাকা-পয়সা নষ্ট করে বাড়ি ফিরে খুব কান্নাকাটি করছে। ইতমধ্যে বড় ছেলেটি খুব খেটেখুটে আগের থেকে প্রচুর সম্পত্তি বানিয়েছে। ছোট ছেলেটির মঙ্গলার্থে বাবা ওদের একটা বাছুরকে বলি দিয়েছে। বড় ছেলেটি ফিরে এসে যখন জানতে পারল তাদের একটা বাছুরকে জেবা করা হয়েছে তখন সে খুব রেগে গিয়ে বাবাকে বলছে 'বাবা! তুমি তো আমার জন্য কোন দিন এই ধরণের কাজ করলে না। যে ছেলে আমাদের এত জ্বালাল, সব সম্পত্তি বিক্রী করে চলে গেল তার জন্য এরকম করলে'! তখন বাবা বললেন 'দেখ! তুমি তো সব সময়ই আমার কাছে আছ। কিন্তু আমার এই সন্তান পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে আবার আমার কাছেই ফিরে এসেছে, তার ভালোর জন্যই এটা করা হয়েছে'। এতে কি হয়, আমরা যখন সব মিলে মিশে যাই তখন সেই সম্মনটা আর থাকে না। সেইজন্য একটু দূরে দূরে রাখতে হয়। দুই বন্ধু এক পাড়াতেই মিলেমিশে থাকছে, কিন্তু যখন কোন বন্ধু বাইরে ছিল সে হঠাৎ এসে গেছে তখন তার খাতির বেশী হয়। জামাই যখন শ্বশুড় বাড়ি আসে তখন তার আদর যত্ন বেশী হয়, আর জামাই যখন ঘরজামাই হয়ে থাকে তখন কোন পাত্তা পায় না। এটাই এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলতে চাইছেন, আমি কারুর ঘরজামাই হচ্ছি না। তাই মাঝে মাঝে আমি এই রকম করে থাকি।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'আমি জানি তোমরা আমার জন্য লোকমর্যাদা, ধর্মের পথ, নিজের পরিজন সম্বন্ধী সবাইকে ছেড়ে আমার কাছেই এসেছ। কিন্তু নানান রকমের বিক্ষেপের জন্য তোমাদের মন যাতে আমার কাছ থেকে না সরে যায় সেইজন্য আমি এই রকম ব্যবহার করেছি'। শ্রীকৃষ্ণ শেষে বলছেন 'তোমরা আমাকে যেরকম ভালোবাস এই ভালোবাসার জন্য আমি তোমাদের কাছে ঋণী থাকব। এই ঋণ শোধ করা যায় না'। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের ভালোবাসছেন না তা নয়, তাঁদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই ধরণের আচরণ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদের সব বৃত্তিগুলোকে সরিয়ে দিলেন এরপর যমুনার তীরে গিয়ে শুরু হল মহারাস। সবার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য গীত করতে শুরু করলেন। দেবতারাও আকাশ থেকে এই দুর্লভ মহারাসকে দর্শন করলেন, দেবতারা দেখছেন ভগবান নিজে এই সব লীলা করছেন।

মহারাসের বর্ণনা শোনার পর পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করছেন 'হে মহামুনে! শ্রীকৃষ্ণ তো ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বুকে অবতরণ করেছেন। কিন্তু তিনি অন্য স্ত্রীদের কি করে এই ভাবে স্পর্শ করলেন? আপনি ঋষি এবং জন্ম থেকেই ব্রহ্মচারী, আপনি আমাকে এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলুন'। শুকদেব এইবার পরীক্ষিৎএর এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ভাগবতের এই অংশটাকে মন দিয়ে অনুধাবন করলে রাসলীলার তাৎপর্যটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। শুকদেব বলছেন *ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাং সাহসম্। তেজসীয়াং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভূজো যথা।।*১০/৩৩/৩০। 'যাঁরা খুব তেজস্বী হন যেমন সূর্য, অগ্নি, যাদের মধ্যে ঈশ্বর সামর্থ আছে, কখন কখন দেখা যায় এনারা প্রকৃতির নিয়মকে অতিক্রম করে যান। কিন্তু তাতে তাঁদের কোন দোষ দেখা যায় না। যাঁদের মধ্যে ঐশ্বরীয় শক্তি আছে তাঁরা অনেক সময় তাঁর যে ধর্ম সেটাকে অতিক্রম করে যান। এতে তাঁদের কোন দোষ হয় না। বলা হয় যে সামর্থবান পুরুষের কোন দোষ হয় না। স্বামীজী লিখছেন *কৃত্যং করোতি কলুষম্,* ঈশ্বরীয় শক্তি যখন ভেতরে চলে আস তখন যেটা কলুষ সেটাও কৃতকৃত্য হয়ে যায়। সূর্য ও অগ্নি ঈশ্বরীয় শক্তিতে সামর্থবান পুরুষদের কখন কখন ধর্মের উল্লঙ্ঘন এবং অনুচিত হঠকারিতা করতে দেখা যায়। যেমন অগ্নি অনেক সময় দুঃসাহসের কাজ করছে, অগ্নির সেবা করা হচ্ছে তাও দাবানল লাগিয়ে দিচ্ছে, বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। এর জন্য অগ্নিকে কেউ দোষ দেয় না। যাদের সামর্থ নেই তাদের সামর্থবান পুরুষের কর্ম করা তো উচিতও নয় এমন কি চিন্তা করাও উচিত নয়। ঈশ্বরীয় শক্তিতে হনুমান এক লাফে সমুদ্র লঙ্ঘন করে এক দুঃসাহসের কাজ করে দিলেন। অন্যদের এটাকে নকল করতে নেই। শ্রীরামচন্দ্রও হনুমানকে আলিঙ্গন করে বলছেন 'তোমার মতো এই কাজ কেউ করতে পারে না'। এখানে বলছেন এই রকম কাজ করা তো দূরের কথা চিন্তাও করবে না। বাল্মীকি রামায়ণেই আছে সবাই যখন

সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কায় পৌঁছেছে তখন রাবণকে দেখতে পেয়ে অঙ্গদ রাবণকে মারতে এক ঝাঁপ দিয়ে তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। রাবণকে মারতে পারেনি কিন্তু অনেক ঝগড়া করার পর অঙ্গদ আবার ফিরে এসেছে। তখন শ্রীরামচন্দ্র অঙ্গদকে খুব তিরস্কার করেছিলেন – 'তুমি এটা কি করলে! অরক্ষিত অবস্থায় তুমি এইভাবে রাবণের মুখোমুখি হয়ে হঠকারিতার কাজ করেছে। তোমার এই কাজ করার কথা নয়। আজ তুমি যদি রাবণের হাতে মারা যেতে আমাদের কলঙ্ক হয়ে যেত। আর কি মুখ নিয়ে আমরা তোমার মা তারার সামনে দাঁড়াতাম'। হনুমান এক লাফ দিয়ে সমুদ্র লঙ্ঘন করে সীতার খোঁজ নিয়ে ফিরে আসার পর শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে বুকে জড়িয়ে নিচ্ছেন। অঙ্গদ হনুমানের থেকে অনেক কম দুঃসাহসের কাজ করেছে, এক ঝাঁপ মেরে রাবণের প্রাসাদে উঠে গেছে রাবণকে মারবে বলে। কিন্তু কোন রকমে ছাড়াছাড়ি হয়ে অঙ্গদ ফিরে এসেছে। এই ক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্র অঙ্গদকে খুব তিরস্কার করেছেন। কারণ হনুমান হলেন ঈশ্বরীয় শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, অঙ্গদ কিন্তু তা নয়। ঈশ্বরীয় শক্তি না হলে মর্যাদাকে কখনই লঙ্ঘন করতে নেই। রোজ খবরের কাগজে কত রকমের স্ক্যাম বেরোচ্ছে আর যারা এর সঙ্গে জড়িত তারা দিব্যি তাদের পদমর্যাদা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি আপনি একটা চুরি করি, পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে জেলে ঢুকিয়ে দেবে। তারা সামর্থবান পুরুষ তাদের কিছু হবে না, হবে আমাদের কারণ আমরা সামর্থবান নই। এটা ঠিক তারা যে আচরণ করে সেটা সব সময় ধর্ম পথ নাও হতে পারে, সেটাকে যে সবাই আচরণ করে তাও নয়। কিন্তু দেখা যায়, যেমন আমেরিকা একটা অন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের অজান্তে তাদেরই দেশে একটা স্পেশাল টাস্কফোর্স পাঠিয়ে বিন লাদেনকে শেষ করে দিল। এটা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। এই কাজ যদি ভারত করতে যেত তাহলে নিউক্লিয়ার বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেত। পাকিস্থান বলে দিয়েছে ভারত যেন এই ধরণের দুঃসাহসের কাজের কল্পনাও না করে। কিন্তু আমেরিকাকে কিছুই করতে পারল না। সামর্থবান পুরুষ অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু তাতে তার দোষ কিছু হয় না। যারা সামর্থহীন পুরুষ তাদের করা তো দূরের কথা চিন্তাও করতে নেই। সেইজন্য শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ যেটা করেছেন সেই কাজ আমার তোমার কল্পনাও করতে নেই। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, সামর্থবান পুরুষ।

শুকদেব উপমা দিচ্ছেন সমুদ্র মন্থন করতেই এমন হলাহল বেরিয়ে এল যাতে সমস্ত জগৎ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কে এই বিষকে ধারণ করবে? তখন ভগবান শিব সেই হলাহলকে কণ্ঠে ধারণ করে জগতকে রক্ষা করলেন। কিন্তু কোন মুর্খ যদি বলে শিব আমার গুরু আমিও একটু পান করে দেখি তাহলে সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। পরীক্ষিৎকে বলছেন 'হে পরীক্ষিৎ! তুমি এটা মাথাতে রেখো ভগবান হলেন সত্য সঙ্কল্প, উনি যেটাই সঙ্কল্প করেন সেটাই চিন্ময়ী লীলা হয়ে যায়। এর মধ্যে কোন কাম ভাব ছিল না, এই ব্যাপারে তুমি কখনই ভুল ভেবো না'।

এখানেই পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করছেন 'শ্রীকৃষ্ণ তিনি ধর্মের পূর্ণ অবতার। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হল ধর্মের সংস্থাপন করা। কিন্তু তিনি এই অধর্ম কাজ কি করে করতে পারলেন, সেখানে যে কুমারী মেয়েরাই ছিল তা নয়, অনেক বিবাহিতা রমণীরাও সেখানে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তাঁর কাম ভাব না থাকতে পারে কিন্তু ধর্ম তো উল্লঙ্ঘন হয়েছে'। রাসলীলার ব্যাপারে এই প্রশ্নটা প্রায়শই জাগতিক মনোভাবাসম্পন্ন লোকেরা করে বসে। এই প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব যা বলেছেন সেটা আমরা এর আগে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি। যাঁরা ঈশ্বরীয় শক্তিতে শক্তিমান হয়েছেন তাঁদের কখন কখন দেখা যায় তাঁরা নিজেদের মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করেন। এর উদাহরণ হল হনুমান, সূর্য, অগ্নি ইত্যাদি এনারা মাঝে মাঝে কিছু দুঃসাহসের কাজ করে বসেন যেটা সাধারণ লোকেদের পক্ষে করা তো দূরের কথা চিন্তা করাও উচিত নয়।

শুকদেব বলছেন *ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ।।* ১০/৩৩/৩২। এই ধরণের সামর্থ পুরুষের বচন সত্য বলে জানতে হবে, এই কথা গুলোই ঠিক ঠিক উপদেশ এবং এই কথাকেই জীবনে অনুসরণ করে চলতে হয়। তিনি যে রকম আচরণ করেছেন *তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ* কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের এই আচরণেরও অনুকরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সব সময় করতে নেই। যারা বুদ্ধিমান পুরুষ তাদের পক্ষে জরুরী হল ঈশ্বরীয় ব্যক্তির যে যে আচরণগুলি লোকশিক্ষার্থে প্রদত্ত উপদেশের অনুরূপ শুধু সেগুলো অনুকরণ করবে। তার বাইরে করবে না। যেমন শিব হলাহল পান করেছিলেন। একদিকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে অপরের দুঃখ-কষ্টকে দূর করতে সচেষ্ট হবে। এটা গেল প্রথম দিক। দ্বিতীয় হল তুমি বেঁচে থাকলেই ধর্ম সাধন হবে, তার বাইরে ধর্ম সাধন হবে না। আর তৃতীয় হল দুঃসাহস করো না। এই উপদেশ শোনার পর আমি যখন দেখলাম শিব হলাহল পান করেছেন, তখন আমি দেখছি আমার ইষ্ট শিব বিষ পান করেছিলেন আর আমার সামনে লোকের এত দুঃখ-কষ্ট সেটাকে আমি দূর করতে পারবো না! দূর করতে গিয়ে আমার জীবনহানি হয়ে গেল। এই কাজটাকে নিষেধ করা হচ্ছে। বলছেন, ঈশ্বরীয় ব্যক্তিকে বিভিন্ন কারণে অনেক কিছুই করতে হয়। কিন্তু সেইটাকে কখন আচরণ করতে নেই। তাহলে কি আচরণ করতে হবে? ওনার যে আচরণ গুলো তাঁর উপদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্য আছে শুধু মাত্র সেইটাই অনুকরণ করতে হবে, তার বাইরে কিছু করতে

নেই। এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের উপদেশ দেওয়া হয় বড়রা বা গুরু যে রকম আচরণ করবে সেই রকম করবে, এই উপদেশ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। এই ব্যাপারে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত দেন। অন্যান্যদের যে মতই হোক না কেন ভাগবত এই ব্যাপারে তার খুব বলিষ্ট মত বলে দিচ্ছে। অধিকারী পুরুষ যাঁরা তাঁরা যা উপদেশ দিয়েছেন শুধু সেটাই অনুসরণ করবে। আর তাঁরা জীবনে যা কিছু করেছেন তারমধ্যে সেগুলোই অনুকরণ করবে যেগুলো তাঁর উপদেশের সঙ্গে খাপ খায়।

এখানে এটাই বলে দেওয়া হয়েছে *বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ*, বুদ্ধিমান পুরুষদের উচিত তারা এটাই করবে। কারণ মুর্খরা উপদেশ তো শুনবেই না, ঠাকুর যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো পালন করবে না কিন্তু তিনি যেগুলো করেছেন সেগুলো মুর্খরা নকল করতে যায়। শাস্ত্র এখানে পরিষ্কার ভাবে নিষেধ করছে, ওরকমটি করো না। স্বামীজী সাধুদের খুব কড়া করে বলে দিয়েছেন মেয়েদের থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু তিনি যখন বিদেশে গেছেন সেখানে অনেক ভক্ত মহিলা বা তাঁর শিষ্যারা, অনুরাগীণিরা তাঁর পাশে পাশে ঘুরতেন। স্বামীজীর এই আচরণকে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা কখনই নকল করতে পারেন না। মহাপুরুষদের যে আচরণগুলো তাঁর উপদেশের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না সেগুলো কখন অনুকরণ করবে না। কেন করবে না? একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনি একটা কিছু করেছেন, আর তিনি হলেন সামর্থবান পুরুষ। ঈশ্বরীয় শক্তিতে যাঁরা সামর্থবান হয়েছেন তাঁরা কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে এমন কিছু করেন যেটা দুঃসাহস মনে হবে। যাঁরা স্বামীজীর জীবনী খুব মনযোগ দিয়ে পড়েছেন তাঁরা এই ধরণের কিছু স্বামীজীর কাজ সম্বন্ধে জেনে থাকবেন। স্বামীজী একবার অমরনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন। সঙ্গে নিবেদিতাও ছিলেন। স্বামীজীর তাঁবুর পাশেই নিবেদিতারও তাঁবু লাগান হয়েছিল। তখন বাইরের একজন সাধু স্বামীজীকে বলছেন 'স্বামীজী! আমি জানি আপনি পরমহংস। কিন্তু এইভাবে একটি মেয়ের তাঁবু যদি আপনার তাঁবুর পাশে থাকে তাতে অন্য সাধুরা যাঁরা অমরনাথ দর্শনে যাচ্ছেন, আপনার অবস্থা না বুঝে তাঁরাও আপনাকে নকল করতে শুরু করবে। এতে ধর্মের হানি হবে'। স্বামীজী কিন্তু শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু সরিয়ে নিলেন। অন্য দিকে স্বামীজীর নারী পুরুষ ভেদের কোন অনুভবই ছিল না।

লাটু মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে কাশ্মীরে ডাল লেকে বোটে আছেন। রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর বোটের মুসলমান মালিকের তেরো চোদ্দ বছরের মেয়ের হাত দিয়ে মহারাজদের জন্য পান পাঠান হয়েছে। রাত্রিবেলা লাটু মহারাজের কাছে একটা মেয়ে পান নিয়ে তাঁর কাছে এসেছে, এটা দেখেই লাটু মহারাজ ডাল লেকে ঝাঁপ দিয়েছেন। সে এক যাচ্ছেতাই অবস্থা। মাঝিরা কোন রকমে তাঁকে জল থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন। অথচ স্বামীজী দিনরাতই ওদের সাথে কাটাচ্ছেন। কিন্তু লাটু মহারাজ নিজের ব্যাপারে খুব পরিষ্কার আমার এই শক্তি নেই। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ একবার স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করছেন 'ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন থেকে দূরে থাকতে বলেছেন কিন্তু আপনি এইভাবে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেন কেন?' ঠাকুর স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে খুব নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন মেয়েদের একেবারে কাছে আসতে দিবি না। স্বামীজী হেসে বললেন 'ঠাকুর তোকে ওই রকম বলেছেন আমাকে অন্য রকম বলেছেন'। স্বামীজী পরমহংস অবস্থায় ছিলেন, ওই অবস্থায় তাঁর নারী-পুরুষের ভেদটা একেবারেই ছিল না। তাই তিনি কাজকর্মের স্বার্থে এই ধরণের কিছু আচরণ করতে পারেন, যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে দুঃসাহসের কর্ম বলে মনে হবে। কিন্তু অন্য সন্ন্যাসীরা এগুলোকে কখনই নকল করতে পারে না। ইসলামে প্রথম অবস্থাতেই এই সমস্যা হয়েছিল আর এখনও এই সমস্যা চলছে। পয়গম্বর মহম্মদের কাছে যে আদেশগুলো এসেছিল সেই উপদেশ গুলো ছিল মক্কা মদিনার মাঝে যে ছোট্ট মরুভূমি অধ্যুষিত এলাকার আদিবাসী ছিল তাদের জন্য। এরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, এবার ইসলামের নামে সবাই একত্রিত হয়ে গেল। একতাবদ্ধ হয়ে এখন তারা একটার পর একটা জাতি, সম্প্রদায় দেশ জয় করতে শুরু করল। বিভিন্ন দেশ জয় করে যখন তারা এগিয়ে গিয়ে গেল তখন তারা দেখল কোরানে যা যা উপদেশ দেওয়া আছে সেগুলো যদি সব পালন করা হয় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে কারণ এই দিয়ে প্রশাসন চালানো যাবে না। একটা গোষ্ঠির সংস্কৃতিকে সারা দেশের সবার জন্য প্রযোজ্য করা যায় না। হিন্দুরা গোমাংস খায় না। এখন হিন্দুরা যদি মুসলিম দেশে গিয়ে রাজত্ব করতে বসে গিয়ে বলে দিল এখন থেকে গোমাংস খাওয়া বন্ধ। এই ধরণের নিষেধাজ্ঞা সেখানে দেওয়া চলবে না। এর থেকে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। এরাও দেখলে কোরানের সব কথা চলছে না। তখন নতুন করে কিছু করতে হবে। কিন্তু কোরানের পরে নতুন আইন করবে কি করে? সেটা তো কখন করা যাবে না। ইসলামের পণ্ডিতরা তখনও রয়েছেন। ইসলাম ধর্ম তখন সবে পত্তন হয়েছে, সবে পঞ্চাশ ষাট বছর অতিক্রম করেছে। তখন এরা সংগ্রহ করতে লাগলেন, কোরানের বাইরে পয়গম্বর বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কি কি করেছেন এবং কি কি বলেছেন। এগুলোকে তারা পরম্পরার মারফৎ বিভিন্ন সূত্র ধরে বার করতে থাকলেন। যেমন একটা সূত্র মারফৎ জানতে পারলেন পয়গম্বর একবার সফরে যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে তার জল পিপাসা পেয়ছে। তখন ওই রকম পরিস্থিতিতে মহম্মদ কিভাবে জল পান করেছিলেন? তিনি এই

ভাবে জল পান করেছিলেন। কিন্তু এগুলো কে দেখেছে বা কে জানে? তখন বলা হল ওনার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনিই জানেন। তিনি এনাকে বলেছিলেন। মোটামুটি দেখা যাচ্ছে তিনটে স্টেজে এগুলোকে সংগ্রহিত হয়েছিল। মহম্মদের কাজ সেটাকে একজন দেখেছেন, তিনি বলেছেন আরেকজনকে, সে বলেছে এদের যারা সংগ্রহ করে লিখছে। এর মধ্যে কেউ যদি থেকে থাকে যার কথা বিশ্বাস যোগ্য নয়, সেই কথাগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলোকে পুরো সংগ্রহ করে বানান হল হাদিস। ইসলামের এই আইন হাদিসের উপরেই চলে। হাদিসকে সরিয়ে দিলে ইসলামিক আইন চলা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। কোরানে যদি কোন সমস্যার সমাধান না পাওয়া যায় তখন এরা হাদিসে দেখবে সেখানে এই ব্যাপারে কিছু বলা আছে কিনা। পরের দিকে নিজের নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এরা নতুন নতুন হাদিস দিতে শুরু করল। তখন আবার একটা সীমারেখা বেঁধে দেওয়া হল, এই সীমার বাইরে যাওয়া যাবে না। বর্তমানে দিনকাল সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে, পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন সমস্যা এসে গেছে। যেমন সিনেমায় নায়ক নায়িকার বিয়ে হয়েছে, এখন এই বিয়েটাকে সত্যিই বিয়ে বলে গণ্য করা হবে, নাকি নতুন করে বিয়ে করতে হবে। এই সমস্যা আগে ছিল না, আর এর সমাধান হাদিসেও পাওয়া যাবে না। আরব দেশে যখন পয়গম্বর এসেছিলেন তখন তো সিনেমা ছিল না। এখন মৌলবীরা কোরান হাদিস ঘেঁটে খুঁজে খুঁজে নিজের বুদ্ধির মত সমাধান দিচ্ছে। সেই সমাধানকে আবার অনেক মৌলবীরা আপত্তি করছে। এইভাবে ইসলামে তিন রকমের কথা পাওয়া যায়। প্রথম আল্লার নিজের কথা, দ্বিতীয় মহম্মদ যা যা করেছিলেন এবং তৃতীয় মহম্মদ যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলো কেউ শুনেছে, সেটাকেই তিনি পরে গিয়ে বলছেন মহম্মদ আমাকে বলেছিলেন অমুক পরিস্থিতিতে অমুক জিনিষ করা যেতে পারে। কোরানে বলা আছে চারটে বিয়ে করতে পারবে। কেন বলেছিলেন? আগে আরব দেশে বিয়ে বলে কোন জিনিষই ছিল না। বিয়েটাকেই মহম্মদ একটা সামাজিক নিয়মে বেঁধে দিলেন। বেঁধে দিয়ে বলে দেওয়া হল, চারজনকে বিয়ে তখনই করবে যদি চারজনকেই সমান ভালোবাসতে পারবে। কিন্তু অন্য দিকে মহম্মদের চারের অধিক বিয়ে ছিল। এখন যদি বলা হয়, কোরানে চারটে বিয়ের কথা বলা হয়েছে কিন্তু মহম্মদের তেরোটা বিয়ে। না, এখানে সেই আপত্তি করা যাবে না। ওনার সেই অধিকার ছিল। এখানে ভাগবতে যেটা বলে হয়েছে। মহম্মদ ঈশ্বরীয় শক্তিতে সম্পন্ন সামর্থবান পুরুষ। তাছাড়া কোন একটা পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য মহম্মদকে এই কাজটা করতে হয়েছিল। কিন্তু অন্যরা তা করতে পারবে না। অন্যরা তাহলে কি করবে? যেটা তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। যারা মহৎ পুরুষ যারা সামর্থবান পুরুষ তাদের কোন দোষ হয় না। মহাভারতেও বলা হয়েছে গুরুজন যেটা করতে বলেন সেটা করতে হয়, গুরুজনরা যেটা করেন সেটা করতে নেই। আবার অনেকের মনে হয় তিনি যেটা করেছেন আমিও সেটাই করব। এগুলো খুব প্রাচীন বিতর্কিতত বিষয়। যেমন মহাভারতেই বলা হয়েছে মহাপুরুষরা যে পথে গেছেন সেটাই পথ, *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*। গীতাতেও ভগবান বলছেন *যদ্ যদাচারতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ*। শ্রেষ্ঠ পুরুষ যেমন করেন বাকিরা সেই রকমই আচরণ করেন। সেইজন্য এখানে শুকদেব পরীক্ষিৎকে আগে 'বুদ্ধিমান' এই শব্দটা ব্যবহার করেছেন। আগে দেখ তোমার বুদ্ধি আছে কি নেই। বুদ্ধি থাকলে তখন সেই আচরণ গুলোই করবে যেটা তাঁর উপদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আর বাকি যা কিছু করবে তিনি যেভাবে করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেইভাবেই করবে। যারা মূর্খ তারা নিজের মতই আচরণ করবে। যারাই বুদ্ধিমান তারা আচার্যগণ যেটা করেছেন সেটা কখনই করতে যাবে না। সেইজন্যই শুকদেব বলছেন এই রাসলীলাকে যদি কেউ নকল করতে যায় তাহলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। কারণ শ্রীকৃষ্ণের যে উপদেশগুলো আছে সেই উপদেশের সাথে এই রাসলীলা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই রাসলীলা কেন করেছিলেন সেটা তিনিই জানেন আর এটা তাঁর ব্যাপার। কারণ সামর্থবান পুরুষের কোন দোষ হয় না।

শুকদেব আবার বলছেন *কুশলাচরতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যত। বিপর্যয়েণ বানর্থো নিরহংকারিণাং প্রভো।*।১০/৩৩/৩৩। এই যে যাঁরা সামর্থবান পুরুষ এনারা সবাই অহঙ্কারশূন্য পুরুষ। শুভকর্ম আচরণের দ্বারা তাঁদের কোন সাংসারিক স্বার্থ সাধিত হয় না, অশুভকর্মের দ্বারাও কোন অনর্থ হয় না। সেইজন্য দেখা যায় শুভকর্মে তাঁদের কোন সাংসারিক স্বার্থ থাকে না আর অশুভ কর্ম করার সময় অনর্থের কোন ভয় থাকে না। মহাপুরুষরা সব সময় স্বার্থের উর্দ্ধে আর অনর্থের পারে থাকেন। কোন কর্মের পেছনেই তাঁদের কোন কামনা-বাসনা থাকে না। ফলে তিনি অনেক কিছুই করতে পারেন। কোন শুভ কর্ম করার সময় তাঁর মনে এই ধরণের কোন সঙ্কল্প থাকে না যে এই কর্মের ফল তিনি পাবেন। ঠিক তেমনি যখন কোন অশুভ কর্ম করেন তখন তাঁর মনে এই ভয় থাকে না যে এই কর্মের জন্য আমার অনেক অনর্থ হবে। শ্রীরামচন্দ্রের বালিবধ একটা অশুভ কর্ম, এটা অনর্থক কর্ম। তিনি আড়াল থেকে লুকিয়ে বালিকে বধ করেছেন, বালি আবার শ্রীরামচন্দ্রের শত্রুও নয়। এই ধরণের কাজ আমরা করতে পারিনা। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যখন বালিকে বধ করেছেন তাতে তাঁর কোন অশুভ কর্ম হয়নি। কারণ, এই কর্মের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের কোন অহঙ্কার জড়িয়ে নেই। এই ব্যাপারে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে মনে করা যেতে পারে, রানী রাসমণির গায়ে ঠাকুরের চাপড় মারা। এই কাজে ঠাকুরের কোন অহঙ্কার

জড়িয়ে ছিল না। এখানেও নিজের কোন স্বার্থ নেই আর তাতে কোন অনর্থের ভয়ও নেই। ঈশ্বরের কাছে এসে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, এতে রানীর অমঙ্গল হচ্ছে। তাই ঠাকুর একটা চড় মেরে রানীকে সজাগ করে দিলেন। কিন্তু নিজের মালিককে চড় মারা অতি দুঃসাহসের কাজ। এখন যদি বলা হয়, নিজের বসের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হয় ঠাকুর পথ দেখিয়ে গেলেন। ঠাকুর পথ দেখিয়ে গেছেন নিজের মালিককে চড় মেরে কি করে সিধে করতে হয়। ঠাকুর একটা বিপ্লব করে গেলেন, ঠাকুরই প্রথম বিপ্লবী। এই ভাব নিয়ে যে দেখবে তার সর্বনাশ হতে কিছু বাকি থাকবে না। পাপ-পূণ্যের বোধ তখনই আসে যখন সেই কর্মের সাথে আমি নিজেকে জুড়ে দেব। এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বুঝে নিতে পারলে শাস্ত্রের অনেক কথা আমাদের বুঝতে খুব সহজ হয়ে যায়।

শুভকর্মও যখন তিনি করেন তখনও তিনি কোন ফলের আশা করেন না আর অহঙ্কারহীন হয়ে করেন। শ্রীমা বাগবাজারে থাকাকালীন প্রায়শই গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন। গঙ্গার ঘাটের কাছে এক ব্রাহ্মণকে শ্রীমা ফল দিয়েছেন। ফল দিয়ে তিনি ব্রাহ্মণকে বলছেন 'এই ফল তোমার আর এর ফলও তোমার'। শ্রীমার এই কথার তাৎপর্য হল, এই ফল তো তোমাকে দেওয়া হল আর এই দানের যা ফল সেটাও তোমারই। এটাই নিরহঙ্কার। অহঙ্কারই আমাকে অন্য কিছুর সঙ্গে জুড়ে দেয়। রেলের বগিগুলো যেমন একটার সাথে আরেকটা কাপ্লিং দিয়ে জুড়ে থাকে। মন ও বুদ্ধিকে কার্য আর তার ফলের সঙ্গে যে জুড়ে দেওয়ার কাজটা করে অহঙ্কার। মহাপুরুষদের এই অহঙ্কারটা অর্থাৎ কাপ্লিংটা খুলে গেছে। দুটো নৌকা পাশাপাশি দড়ি বা শেকল দিয়ে বাঁধা আছে, দুটোই চলছে। এখন বাঁধনটা খুলে দেওয়া হয়েছে। নৌক দুটো এখনও পাশাপাশি যাচ্ছে কিন্তু বাঁধনটা খুলে গিয়ে আলাদা হয়ে গেছে, দুটো নৌকার মধ্যে আর কোন সম্পর্ক নেই। অবতার বা মহাপুরুষদের সাথে জাগতিক ও মানবীয় শুভ অশুভকে যোগ করে দেওয়া যায় না। গোপীদের স্বামীরা এবং যারাই শরীর ধারণ করে আছে তাদের অন্তঃকরণে যে আত্মা বিরাজমান, তিনি হলেন সাক্ষী পরমপতি, তিনিই দিব্য চিন্ময় রূপকে অবলম্বন করে এই লীলা করছেন। আমরা সবাই আলাদা আলাদা, আমাদের শরীর আলাদা, মন আলাদা কিন্তু চৈতন্য সত্তা রূপে আমরা সবাই এক। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের আত্মাই শুধু নন, তিনি আমার আপনার সমস্ত প্রাণির আত্মা। সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক ভাবেই গোপীদের স্বামী, শুধু স্বামীই নন, তিনিই আসল স্বামী। আমরা সবাই কার কথাতে চলি? স্ত্রী স্বামীর কথায় চলে, স্বামী স্ত্রীর কথায় চলে, সন্তান বাবা-মার কথায় চলে। কিন্তু আসল মালিক কে? ভগবান। ভগবান যখন ভার নিয়ে নেন তখন বাকি সবাই নিষ্প্রভ হয়ে পেছনের দিকে চলে যাবে। একটা থানার ওসির উপরে মহকুমা শাসক আছে, মহকুমা শাসকের উপরে জেলা শাসক আছে সব জেলা শাসকের উপরে আছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন থানার ওসিকে মহাকুমা শাসক একটা আদেশ দিয়েছে, আর ঠিক সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী এসে গেছেন। তিনিও ওসিকে একটা অন্য আদেশ দিয়েছেন। এখন ওসি কোন আদেশটা পালন করবে? কোন প্রশ্নই নেই, মুখ্যমন্ত্রী সবার উপরে তাঁর আদেশকেই আগে কার্যকর করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলে আসল মালিক, বাকিরা সবাই ডেলিগেটেড ক্ষমতাতে সীমাবদ্ধ। গোপীদের আসল মালিক হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁদের স্বামীরা হলেন ডেলিগেটেড ক্ষমতার লোকদের মত। সবারই ভেতরে যিনি অন্তর্যামী হয়ে চিন্ময় শক্তি রূপে বিরাজ করছেন তিনিই হলেন আসল মালিক। তিনি তাঁর নিজের জিনিষকে চেয়ে নিয়েছেন এতে আপত্তি করার কি আছে। একেক গোপীর আলাদা মালিক নন, সবার মালিক সেই এক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই এখন তাঁর নিজের জিনিষকে নিয়ে চিন্ময় লীলা করছেন। সেইজন্য এইখানে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। পরীক্ষিৎ এইটাই শুকদেব বলছেন, তুমি যে মনে করছ গোপীদের স্বামীরা গোপীদের মালিক তা নয়, ভগবানই মালিক। তাই এই প্রশ্ন করা চলে না।

শুকদেব বলছেন, ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তিনি এই রকম নানান রকমের লীলা করেন। এই লীলা করলে কি হয়? ভগবানের এই সব লীলা কথা শ্রবণ ও অনুধ্যান করতে করতে ঈশ্বরভক্তি পরায়ণ হয়ে যায়। এই জিনিষগুলো আধুনিক যুগের শিক্ষিত যুব সমাজ বুঝতে পারবে না। কিন্তু বৃন্দাবনে এখনও রিক্সাওয়ালার হর্ন না বাজিয়ে মুখে রাধে রাধে করে। ওখানে সবাই রাধে রাধে করে, সবারই রাধারানীর ভাব, আমার মালিক সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনে রাধাকে নিয়ে মজা করে কোন শব্দও উচ্চারণ করা যায় না। বৃন্দাবনে যে এই ভক্তিভাব এসেছে এটা এইভাবেই লীলাখেলার শ্রবণ মনন করেই এসেছে। ঈশ্বরের লীলা কোন মানবীয় নয়, তাঁর সব লীলাই চিন্ময়ী লীলা।

শ্রীকৃষ্ণের এই ধরণের চিন্ময়ী রাসলীলাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুকদেব পরপর কতকগুলি যুক্তিকে সামনে নিয়ে এসেছেন। প্রথম যুক্তি হল যিনি ঈশ্বরীয় শক্তি সম্পন্ন সামর্থবান পুরুষ তাঁরা অনেক সময় দুঃসাহসের কাজ করেন। আর যিনি ঈশ্বরের অবতার তিনি যে কোন জিনিষ করতে পারেন। দ্বিতীয় যুক্তি হল, যিনি আচার্য, অবতার তিনি যা করেছেন সেটা সাধারণের করতে নেই। তিনি যা বলেছেন সেটাই করবে। আর তাঁর সেই আচরণকেই অনুসরণ করা যাবে যেগুলো তাঁর উপদেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তৃতীয় যুক্তি হল, এনারা সবাই অহঙ্কার হীন পুরুষ। অহঙ্কারহীন হওয়ার জন্য কোন

শুভকর্ম যেমন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না তেমনি কোন অশুভ কর্মও তাঁকে স্পর্শ করে না। তাঁর না থাকে কোন স্বার্থ আর না থাকে কোন অনর্থের ভয়। সেইজন্য পাপ বা পূণ্য কোনটাই তাঁর লাগে না। চতুর্থ যুক্তি হল, তিনি হলেন আসল মালিক। আসল মালিক যখন এসে গেছেন তখন তো আর কোন কথাই উঠতে পারে না। তুমি যে মনে করছ গোপীদের আসল মালিক হল তাঁদের শ্বশুড়, স্বামী পুত্ররা, কিন্তু এরা সবাই ডেলিগেটেড মালিক কিন্তু আসল মালিক শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর জিনিষ তিনি নিয়েছেন, এখানে আর কোন সন্দেহ করা যাবে না আর উচিতও নয়। আর শেষ কথা হল তিনি এই লীলা খেলা করেছেন এই কারণে যে, যাতে সাধারণ মানুষ এই দিব্যলীলা শ্রবণ মনন করে তাদের মনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাব জাগ্রত হয়। যোগীরা যখন যোগের দ্বারা সাধনা করেন তখন তাঁদের মনে ভক্তিভাব থাকে না, জ্ঞানীদের সাধনা পথেও ভক্তিভাব হয় না। কর্মযোগেও ভক্তি থাকে না। একমাত্র যাঁরা ভক্তি পথকে অবলম্বন করেন তাঁদেরই ভক্তিভাব থাকে। কিন্তু যোগীরা বা জ্ঞানীরা যখন এই লীলাকথাগুলি আস্বাদন করবেন তখন তাঁর ভেতরেও একটা ভক্তভাবের উদয় হয়ে তাঁর সাধনাকে আরও পরিপুষ্ট করে দেবে।

একেবারে শেষে শুকদেব বলছেন *বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।*১০/৩৩/৪০। যে ধীর পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই মহারাসলীলাকে চিন্ময় রাসবিলাস ভেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে বারবার শ্রবণ করবে, বর্ণন করবে ভগবানের শ্রীচরণের তার ভক্তি জাগ্রত হবে। সাথে সাথে তার হৃদয়ে যত রকমের রোগ স্বরূপ বিকার আছে, কাম, কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি আসক্তি এগুলোর বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে। এখানে সাধকদের কথাই বলা হচ্ছে, সাধারণদের জন্য নয়। সাধক সাধনা করে করে বুঝতে পারছে আমার ভেতরে কামভাব বড্ড বেশী আছে, তাদের জন্য বলা হচ্ছে – ভাগবতের দশম স্কন্দের রাসলীলার পাঁচটি অধ্যায়, যেটাকে ভাগবতের হৃদয় বলা হয় থাকে, এই পাঁচটি অধ্যায়কে সে যদি নিয়মিত পাঠ করে যায়, এর শ্রবণ করবে, ব্যাখ্যান করবে, চিন্তন করবে, তার ফলে তার হৃদয়ে যত রকমের বিকার আছে সব চলে যাবে আর কাম-বাসনা যা কিছু ভেতরে জমে আছে সব চিরতরের মত চলে যাবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভাগবতে রাসলীলার বর্ণনা করা হয়েছে। একদিকে ভগবানের নানা রকমের লীলাখেলার চিন্তন মনন করা হচ্ছে।

মধুরভাবে যখন সাধনা করা হয় তখন সাধক নিজেকে স্ত্রী রূপে ভেবে শ্রীকৃষ্ণের গোপী ভাবছেন। পুরুষ বলতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই। যখন নিজেকে গোপী রূপে চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কথা মনন করা হয় তখন পুং ভাবটা চলে যায়। প্রত্যেক সাধককে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নানা রকমের ভাব আরোপ করতে হয়। যাঁরা সন্ন্যাসী সেও নিজেকে একজন পুরুষ বলেই প্রথম থেকেই চিন্তা করে আসছে, কারণ জন্ম থেকেই তাঁর মাথার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তুমি একজন পুরুষ। পুরুষ মাত্রেরই ভাব আছে যে সে একজন পুরুষ। মনের এই ভাবগুলিই শরীরে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে পরিবর্তন হচ্ছে, তার ফলে তার পুরুষ ধারণা আরও দৃঢ় হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় তার বিপরীত ধর্মা নারীর প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই একটা আকর্ষণ ভাব জাগবে। এই ভাবটাকে কাটানর পথ হল এর বিপরীত সাধনা। বিপরীত সাধনা হল নিজেকে নারী রূপে ভাবা। নারী ভাব আনলে নারীর প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকবে না। এখানে পুরুষ কে? পুরুষ হলেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। এই সাধনা সাধারণ সাধকদের জন্য নয়। অধ্যাত্ম বিদ্যা সব সময়ই রহস্য বিদ্যা। নিহিতং গুহায়া, হৃদয়ের গুহার মধ্যে যে জিনিষটা লুকিয়ে আছে, সেটা হল আমার আপনার আধ্যাত্মিক সত্তা। এটাকে নিয়ে সব জায়গায়, সর্ব সাধারণের সামনে আলোচনা করতে নেই। সাধারণ লোক যখন আসে তখন তাদের সাধারণ রকমের কথা বলতে হয়। যারা বিশিষ্ট লোক, যারা আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন তাদেরকেই একমাত্র বিশিষ্ট কথা বলতে হয়। রাসলীলা হল বিশিষ্ট লোকের জন্য।

রাসলীলার সারমর্ম এতই কঠিন যার জন্য এই ধরণের শাস্ত্রগুলোকে ঠিক ঠিক বোঝা যায় না। একদিকে আমরা দেখছি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অন্য দিকে দেখছি শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ। ঠাকুরের অন্তরঙ্গরা যখন ঠাকুরের কাছে গেছেন তখন তাঁরা ঠাকুরকে দেখছেন ভগবান আবার অন্য দিকে দেখছেন মানুষ। দুটো ভাবই যুগপৎ ছিল। এখন ভগবানের সঙ্গে তাঁদের যে সাক্ষাৎকার হবে তার জন্য অনেক কিছু করছেন। ঠাকুর একজনকে বলছেন 'তোকে রাগালুম কেন জানিস? ওষুধটা ঠিক পড়বে'। উপদেশ যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা ঠিক ধারণা হবে। ঠাকুরের মত অবতার পুরুষদের কয়েকজন অন্তরঙ্গ থাকেন। এই অন্তরঙ্গদের মহাপুরুষরা অন্য রকম ভাবে শিক্ষা দেন। যিশু তাঁর বারো জন শিষ্যকে অন্য ভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। মহম্মদও তাঁর কয়েকজন মুষ্টিমেয় অন্তরঙ্গকে অন্য ভাবে জ্ঞান দিয়েছেন। বাকিদের আবার অন্য ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণও ঠিক তাই করেছিলেন। গোপীরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ, সত্যিকারের শিষ্যা। তাঁদের তিনি অন্য ভাবে শিক্ষা

দিলেন। এই যে গোপীদের সাথে ভগবানের একত্ব ভাব আসবে, যেমন বলা হয় গোপীকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণ, কারণ গোপী আর শ্রীকৃষ্ণ এক, রাধা আর শ্রীকৃষ্ণ এক। রুক্মিনীকৃষ্ণ কোথাও বলা হয় না। ভগবানের সাথে এক হওয়ার পথে যে বিঘ্নগুলো আছে, শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার মাধ্যমে এই বিঘ্ন সরিয়ে দিচ্ছেন। শুধু রাসলীলাতেই নয়, চীরহরণ থেকেই সরাতে শুরু করেছিলেন। আবার রাসলীলার সময়ও সরিয়ে যাচ্ছেন। গোপীদের মধ্যে যে সব সময়ই আধ্যাত্মিক ভাব ছিল তা নয়। ভাগবতের বর্ণনানুযায়ী গোপীদের মধ্যে আগে থাকতেই দুটো ভাব ছিল। একদিকে মনে করছেন শ্রীকৃষ্ণ বুঝি ঈশ্বর আবার অন্য দিকে যশোদার আদরের ব্রজের দুলাল বলেও ভাবছে। কিন্তু সবারই মনের মধ্যে যে সাধারণ ভাবটা ছিল তা হল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা, দুর্বার প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ এই দুর্বার প্রেমকেই ধীরে ধীরে দিব্য ভাবে উন্নীত করে দিচ্ছেন। ভালোবাসার টানে ঠাকুরের কাছে কালীপদ ঘোষ নিয়মিত আসা যাওয়া করছেন। কালীপদ ঘোষ তখন প্রচুর মদ্য পান করতেন। ঠাকুর কি করলেন? কালীপদ ঘোষকে বললেন 'যেটাই খাবে মাকে অর্পণ করে খাবে, আর পা যেন না টলে'। ঠাকুর একেবারে প্রথম থেকেই তাকে মদ খাওয়া ছাড়তে বললেন না। আস্তে আস্তে তিনি তাকে পাল্টে দিলেন। ঠিক তেমনি গোপীদের মধ্যে যে কাম ভাব ছিল সেটাকে শ্রীকৃষ্ণ একটা দিব্য ভাবে পরিবর্তিত করে দিলেন। আজ তাই আমরা গোপী আর কৃষ্ণ আলাদা বলি না, বলি গোপীকৃষ্ণ।

তাই বলে এই রাসলীলা সবার জন্য নয়। যাঁরা ভক্তিমার্গের সাধক, যাঁদের প্রেমাভক্তি আছে, তাঁদের সেই ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তি বা পরাভক্তি কি রকম হতে পারে, ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটুপাটু করে। কি রকম আটুপাটু করে সেটাকে দেখানোর জন্য ব্যাসদেব ভাগবতে গোপীদের মাধ্যমে দেখালেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন তখন গোপীদের যে অবস্থা হয়েছিল সাধকের সেই দুরবস্থা হয়। তাই রাসলীলা শুধুমাত্র তাদেরই জন্য যাঁরা ভক্তিমার্গের সাধক। সাধনাতে তাঁদের শেষ অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটাকেই এখানে দেখান হয়েছে। যেমন, ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে সাধনা করছিলেন তখন সেখানে একজন জ্ঞানী সাধু এসেছেন। ঠাকুরেরও তখন জ্ঞান সাধনা চলছে। যেখানে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে সেখানে ঐ জ্ঞানী সাধু খেতে গেলেন না। যেখানে এঁটো পাতা ফেলা আছে সেখানে কুকুররা খাচ্ছে, ঐ জ্ঞানী সাধু কুকুরদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তাদের গলা জড়িয়ে খাচ্ছেন। ঠাকুর ঐ দেখে কাঁদছেন। হৃদুকে বলছেন 'ওরে হৃদু আমারও কি এই অবস্থা হবে'? হলও তাই। সেই একই অবস্থা হয়েছিল। যখন জ্ঞানমার্গ দিয়ে যাবেন তখন ঐ অবস্থাই হবে। তখন আর ভালো আর এঁঠো এই তফাৎ থাকবে না। আর যারা ভক্তিমার্গ দিয়ে যাচ্ছেন তাদের কি অবস্থা হবে? এখানে রাসপূর্ণিমাতে গোপীদের যে বর্ণনা করা হয়েছে এটাই হবে। ঈশ্বরের জন্য ভিজে গামছা নিংড়ানোর মত হৃদয়কে মোচড়ানো হবে। এই অবস্থা যখন হয় তখন তিনি শেষে গিয়ে দেখা দেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে গোপীদের সঙ্গেই ছিলেন, পরে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। যখন গোপীদের অনেক কান্নাকাটি, ছটফটানি হল তারপরেই তিনি আবার গোপীদের মাঝখানে ফিরে এলেন। এই একই জিনিষ নারদের জীবনেও হয়েছিল। নারদ যখন প্রথম তাঁর ইষ্টের দর্শন পেলেন তখন ইষ্ট নারদকে বললেন তোমার মনে এই ভাব জাগানোর জন্য এই দর্শন লাভ করতে পারলে। এরপর তুমি আর দর্শন পাবে না, এবার সাধনা করেই তুমি দর্শন পাবে। ধ্রুবেরও একই জিনিষ হয়েছিল। প্রথমে এক ঝলক দর্শন দিয়ে দিলেন, তারপরই তাঁর ইষ্ট হারিয়ে গেল। এরপর তুমি খেটেখুটে লাভ কর। গোপীরাও প্রথমের দিকে খুব সহজেই শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে গেলেন। তারপরে তিনি তাঁদের খুব করে কাঁদালেন, খুব করে কান্নাকাটি করার পর আবার তাঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হল। এবার এটাই চিরস্থায়ী হয়ে গেল। আধ্যাত্মিক সাধনাতে ঠিক এই জিনিষটা সবার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। সাধনার প্রথমের দিকে একটু সাধনাতেই একটু ঝলক পেয়ে যায়। এই ঝলকটুকু দেওয়া হয় সাধকের মনে অদম্য ইচ্ছাটাকে তৈরী করার জন্য। কিছু দিন সাধনা করে যদি কেউ বলি আমার ঈশ্বরের অনুভূতি হয়েছে, আমার অমুক দর্শন হয়েছে, এগুলো কখন স্থায়ী হয় না। এগুলো দিয়ে আমাদের মনের অদম্য ইচ্ছটাকে জাগিয়ে দেওয়া হয়। গাধা প্রথমে চলতে চায় না। কিন্তু গাধা গাজর খেতে খুব ভালোবাসে। গাধার কাঁধে একটা লম্বা ডাণ্ডা বেঁধে দিয়ে ডাণ্ডার সামনে একটা গাজর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। গাধা ঐ গাজরটাকে খাওয়ার জন্য এগিয়ে পড়ে। গাধা যত এগোয় গাজরটাও এগিয়ে যাচ্ছে, গাজরটা খাওয়ার জন্য গাধাও চলতে থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনে ঠিক তাই হয়, ভগবান একটু এই রকম দেখিয়ে দেন। সাধক তখন তার পেছনে চলতে থাকে। এই রাসলীলা পাঠ তখনই সার্থক হবে যখন ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর সান্নিধ্যের অদম্য ইচ্ছাটা জাগ্রত হবে।